وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ই'তিছাম

الاعتصام

‘আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না সেই সকল দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে যারা ফরিয়াদ করে বলছে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করুন যার অধিবাসীরা অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন পক্ষ অবলম্বনকারী নিযুক্ত করুন এবং আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করুন’ (সূরা নিসা, ৪/৭৫)।

●৯ম বর্ষ ●৭ম সংখ্যা ● মে ২০২৫

Web : www.al-itisam.com

সম্পাদকীয়

ভারত ও ইসরাঈল বনাম বাংলাদেশ ও ফিলিস্তীন

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٩، ذو القعدة و ذو الحجة ١٤٤٦هـ/ مايو ٢٠٢٥م العدد: ٧، الجزء: ١٠٣
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৬ ‖ ঈসায়ী ২০২৫ ‖ বঙ্গীয় ১৪৩২

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১- মে	০২ -যুলক্বা'দাহ	বৃহস্পতিবার	৪.০৩	৫.২৪	১১.৫৫	৩.২১	৬.২৭	৭.৪৮
০৫- মে	০৬ -যুলক্বা'দাহ	সোমবার	৪.০০	৫.২১	১১.৫৫	৩.২০	৬.২৯	৭.৫০
১০- মে	১১ -যুলক্বা'দাহ	শনিবার	৩.৫৬	৫.১৮	১১.৫৫	৩.১৯	৬.৩২	৭.৫৪
১৫- মে	১৬ -যুলক্বা'দাহ	বৃহস্পতিবার	৩.৫২	৫.১৫	১১.৫৫	৩.১৮	৬.৩৪	৭.৫৭
২০- মে	২১ -যুলক্বা'দাহ	মঙ্গলবার	৩.৪৯	৫.১৩	১১.৫৫	৩.১৭	৬.৩৬	৮.০০
২৫- মে	২৬ -যুলক্বা'দাহ	শুক্রবার	৩.৪৭	৫.১২	১১.৫৫	৩.১৭	৬.৩৯	৮.০৪
৩০- মে	০২ যুলহিজ্জাহ	বুধবার	৩.৪৫	৫.১১	১১.৫৬	৩.১৬	৬.৪১	৮.০৭

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	-১	+১
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	০
নরসিংদী	-১	-২	-১
কিশোরগঞ্জ	-৩	-৩	০
টাঙ্গাইল	+১	+১	+৩
ফরিদপুর	+৩	+২	+২
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	০
গোপালগঞ্জ	+৪	+৩	+২
মাদারীপুর	+২	+১	০
মানিকগঞ্জ	+২	+১	+২
শরিয়তপুর	+২	+১	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-২	-২	+২
শেরপুর	-১	-১	+৪
জামালপুর	০	০	+৪
নেত্রকোনা	-৩	-৩	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-২	-৪	-৭
খাগড়াছড়ি	-৫	-৭	-৬
রাঙ্গামাটি	-৪	-৭	-৮
বান্দরবান	-৪	-৬	-৯
কুমিল্লা	-২	-৪	-৩
নোয়াখালী	০	-২	-৩
লক্ষ্মীপুর	০	-১	-১
চাঁদপুর	+১	-১	-১
ফেনী	+২	+৪	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৪	-২

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৮	-৮	-৪
সুনামগঞ্জ	-৭	-৬	-২
মৌলভীবাজার	-৭	-৭	-৪
হবিগঞ্জ	-৫	-৬	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৫	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৬	+৮
নাটোর	+৫	+৪	+৭
পাবনা	+৪	+৪	+৬
সিরাজগঞ্জ	+২	+১	+৪
বগুড়া	+২	+২	+৬
নওগাঁ	+৪	+৪	+৮
জয়পুরহাট	+৩	+৩	+৮

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	০	+১	+৮
দিনাজপুর	+৩	+৪	+১০
গাইবান্ধা	০	০	+৬
কুড়িগ্রাম	-১	-১	+৭
লালমনিরহাট	-১	০	+৮
নীলফামারী	+২	+২	+১০
পঞ্চগড়	+২	+২	+১২
ঠাকুরগাঁও	+৩	+৩	+১২

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৬	+৫	+২
বাগেরহাট	+৫	+৪	+১
সাতক্ষীরা	+৮	+৬	+৪
যশোর	+৬	+৫	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৭
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৪	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৬	+৮
মাগুরা	+৫	+৪	+৪
নড়াইল	+৫	+৪	+৩

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৩	+১	-১
পটুয়াখালী	+৪	+২	-১
পিরোজপুর	+৫	+৩	০
ঝালকাঠি	+৪	+২	-১
ভোলা	+২	০	-২
বরগুনা	+৫	+৩	-১

■ **সূত্র :** মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com) ■ **গণনা পদ্ধতি :** University of Islamic Science, Karachi

৯ম বর্ষ
৭ম সংখ্যা

মে ২০২৫
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
যুলক্বা'দাহ-যুলহিজ্জাহ ১৪৪৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

উপদেষ্টা
- শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
- শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
- শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক
- মো: নাসির উদ্দিন
- আল আমিন
- আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার মো: নাইমুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
আসিফ আহমাদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী
০১৪০৭-০২১৮২২
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল
০১৭২৩-০০৮৪৯১

জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **দারসে কুরআন**
» মুসলিমদের অবক্ষয়ের কারণ ও উত্তরণের পথ ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ **প্রবন্ধ**
» ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান (পর্ব-২) ০৬
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
» কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ (মিন্নাতুল বারী-৩য় পর্ব) ০৯
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» যিলহজ্জ মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত ১১
-মাহবুবুর রহমান মাদানী
» ডিভোর্সের মূল কারণ ধর্মীয় অজ্ঞতা ১৪
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী
» আল্লাহর ভালোবাসা লাভের উপায় ১৮
-মিজানুর রহমান
» হে পবিত্র ভূমি আল-আক্বছা! ২০
-হাফীযুর রহমান
» কেন আমরা গোলাম? ২২
-এহসান বিন কাশেম
» ফিলিস্তীন শব্দে মুসলিম উম্মাহর শিক্ষা! ২৪
-ইবনু মাসউদ

◈ **হারামাইনের মিম্বার থেকে**
» হে বিপদগ্রস্ত! ধৈর্য ধরো এবং ছওয়াবের প্রত্যাশা রাখো ২৬
-অনুবাদ: আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ**
» রক্তাক্ত গাযা: পরিকল্পিত গণহত্যার মুখে এক ভূখণ্ড, এক জাতি ২৯
-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

◈ **চিন্তাধারা**
» ঈদ শোভাযাত্রার নামে তামাশা! ৩০
-মুস্তফা মনজুর

◈ **স্মৃতিচারণ**
» বাংলাদেশে আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর ৩২
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

◈ **দিশারী**
» ব্যভিচারের ধারেকাছেও যেয়ো না! ৩৫
-রাকিব আলী

◈ **জামি'আহ পাতা**
» ভ্রাতৃত্ববোধ ৩৬
-এম. এফ. রহমান বিন সিরাজ

◈ **হেলথ কর্নার**
» তীব্র গরমে নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব: প্রয়োজন সাবধানতা ও সচেতনতা ৩৮
-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

◈ **কবিতা** ৪০
◈ **সংবাদ** ৪১
◈ **সওয়াল-জওয়াব** ৪৫

সার্বিক যোগাযোগ

প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

সহকারী সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৯
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

ভারত ও ইসরাঈল বনাম বাংলাদেশ ও ফিলিস্তীন

যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে বর্বর ইসরাঈল পুনরায় ফিলিস্তীনের গাযায় বিমান হামলা শুরু করেছে। একদিনেই প্রায় চার শতাধিক নারী-পুরুষ ও শিশু নিহত হয়েছে। পবিত্র রামাযানের এই দিনেও গাযাবাসীকে শান্তির সাথে সাহারী, ইফতারী ও তারাবীর ছালাত আদায় করতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনিতেই গত দেড় বছর যাবৎ বিমান হামলা চালিয়ে সমগ্র গাযাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষের মাথা গুজাবার কোনো ঠাঁই নাই। সবেমাত্র যুদ্ধবিরতিতে তারা নিজ নিজ ধ্বংসস্তূপে ফিরতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় নতুন করে বিমান হামলা এক প্রকার মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। রামাযান মাসের এই হামলা পৃথিবীর সকল আন্তর্জাতিক আইনের সরাসরি লঙ্ঘন। দুঃখজনক হলেও সত্য পৃথিবী এই হামলাকে নির্বিকারে চেয়ে চেয়ে দেখছে। মুসলিম বিশ্বের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ!

একদিকে রামাযান মাসে গাযার যখন এই অবস্থা ঠিক তখনি ভারতের মুসলিমরাও ভালো নাই। হোলি খেলাকে কেন্দ্র করে উত্তর প্রদেশের অসংখ্য মসজিদকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া, হোলিতে অংশগ্রহণ না করায় পিটিয়ে মুসলিম যুবককে হত্যা করাসহ অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে ভারত উপমহাদেশের অন্যতম সফল মোঘল শাসক যার ন্যায়নিষ্ঠা ও আমানতদারিতার কথা সমগ্র ভারতবর্ষ জানত সেই মহান শাসক বাদশাহ আলমগীরের কবর নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে অন্যান্য মোঘল শাসক নিজেদের কবরের জন্য বিশাল মাজার তৈরি করলেও বাদশাহ আলমগীর কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন তার কবরের উপর যেন কোনো মাজার তৈরি না হয়। প্রায় ৩০০ বছর অতিক্রম হয়ে গেলেও খুবই সাদামাটাভাবে খোলা আকাশের নিচে বাদশাহ আলমগীরের কবর রয়েছে। কোনো প্রকার যৌক্তিক কারণ ছাড়াই শুধু বিদ্বেষের কারণে একজন মুসলিমের কবরকে অসম্মান করা কখনোই উচিত নয়। বিজেপি সরকার বাদশাহ আলমগীরকে এতটাই ভয় পায় যে, যে শহরে বাদশাহ আলমগীর শুয়ে আছেন সেই শহরের নাম আওরঙ্গাবাদ থেকে সাম্ভাজীনগরে রূপান্তর করেছে। এখন তারা খুলাদাবাদে শুয়ে থাকা বাদশাহ আলমগীরের কবরকেও উচ্ছেদ করতে চায়। অন্যান্য মোঘল শাসকেরা দিল্লী বা আগ্রাকেন্দ্রিক বসবাস করলেও বাদশাহ আলমগীর তার জীবনের অধিকাংশ সময় মহারাষ্ট্রে অতিবাহিত করেছেন। রাজধানীও পরিবর্তন করেছেন। কেননা মহারাষ্ট্রের মারাঠাদের সাথে মোঘলদের যুদ্ধ লেগেই থাকত। তাই যেখান থেকে শত্রুতার ভয় বেশি ছিল বাদশাহ আলমগীর সেখানেই বসবাস করতেন। আজ সেই শত্রুতার আবেগকে ব্যবহার করে তাকে মহারাষ্ট্র থেকে উৎখাত করতে চাওয়া হচ্ছে। বাদশাহ আলমগীরের নামে একটি ন্যক্কারজনক মুভি বানিয়ে তাকে হিন্দু সম্প্রদায়ের শত্রু হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। অথচ বাদশাহ আলমগীর তার প্রজাদের প্রতি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সহৃদয়বান ছিলেন। তিনি তার সুদীর্ঘ ৫০ বছরের শাসন কখনো সরকারি কোষাগার থেকে অর্থ গ্রহণ করেননি। তার শাসন পরিষদে যেমন মুসলিমরা ছিল তেমনি হিন্দুরাও ছিল। এমনকি তার সেনাপ্রধানও অনেক সময় হিন্দু ছিল। তাকে মন্দির ভাঙার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় অথচ সেগুলো ধর্মীয় কারণে ভাঙা হয়নি বরং রাজনৈতিক বিদ্রোহের কারণে ভাঙা হয়েছিল। বরং শতাধিক মন্দিরে তার শাসনামলে সহযোগিতা পাঠিয়ে ফরমান পাঠিয়েছেন। যদি তিনি সত্যিই হিন্দুবিদ্বেষী হতেন আজ ভারতে একটা মন্দিরও অবশিষ্ট থাকত না *(তথ্যসূত্র: Bishambhar Nath Pande, Aurangzeb: A Reinterpretation; Pattabhi Sitaramayya, Feathers And Stones)*।

শুধু তাই নয়, ভারত সরকার মুসলিমদের ঐতিহ্যের ধারক-বাহক ওয়াকফ বোর্ডকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা শুরু করেছে। মুসলিমদের শত বাধা সত্ত্বেও ওয়াকফ বোর্ড আইনের সংশোধনী বিল আইনসভায় পাশ করা হয়। উক্ত সংশোধিত আইনটি এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যেন ওয়াকফ সম্পত্তিতে মুসলিমদের একক কোনো কর্তৃত্ব না থাকে বরং সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এই আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে এক দিনের মধ্যেই আল্লাহর নামে ওয়াকফ করা লক্ষ লক্ষ বিঘা সম্পত্তি হুমকির মুখে পড়েছে। বিপদের মুখোমুখি হয়েছে হাজারো মসজিদ ও মাদরাসা। খর্ব হচ্ছে মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা।

সম্পাদকীয় এর বাকি অংশ ৫৬ নং পৃষ্ঠায়

মুসলিমদের অবক্ষয়ের কারণ ও উত্তরণের পথ

*-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

সরল অনুবাদ: 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করেছেন, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে শোনার শক্তি, দেখার শক্তি আর অন্তর দান করেছেন, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পারো' *(আন-নাহল, ১৬/৭৮)*।

ব্যাখ্যা: মানবজীবনে যাবতীয় সমস্যার সমাধান ইসলাম দিয়েছে। মানবজাতিকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ করে সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান অতুলনীয়। এই অবদান নৈতিক কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক গঠনে হতে পারে। মানুষ যদি ইসলামের আদর্শকে চরিত্র গঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে, তবে অবশ্যই এর ইতিবাচক ফলাফল পাবে। কারণ আল্লাহ মানুষের চারিত্রিক উন্নয়নকে তার উপার্জনলব্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করে এনেছেন, তোমরা কিছুই জানতে না এবং তোমাদের শ্রবণ, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তরসমূহ দান করেছেন, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে করো' *(আন-নাহল, ১৬/৭৮)*। মানুষের চরিত্র গঠন এবং তাদের আচরণগত উন্নতির জন্য যদি প্রতিপালক না থাকতেন, তবে মানবতা এবং সমাজ ধ্বংস হয়ে যেত। একারণেই একজন নবজাতক শিশু মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার কষ্ট ব্যতীত সব অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত হয়ে উন্মুক্ত, স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল জীবন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কবি ইবনুর রুমী নবজাতক শিশুর জন্মগ্রহণকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তিনি বলেন, 'পৃথিবী যখন নবজাতককে তার ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে অবহিত করে, তখন নবজাতক উক্ত ভয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় চিৎকার দিয়ে কাঁদে। তাছাড়া তো তার কাঁদার কোনো কারণ থাকতে পারে না। কেননা সে যেখানে ছিল তার চেয়ে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত স্থানে এসেছে'।[১]

ড. যাকারিয়া ইবরাহীম মানুষের নৈতিক সংশোধনের উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ তার মতে, মন্দের শিকড় সত্তার প্রকৃতির গভীরে প্রোথিত, যা প্রমাণ করে যে, ধ্বংস করা নির্মাণ করার চেয়ে সহজ এবং হত্যা করা শিক্ষিত করা ও জীবন দানের চেয়ে হালকা। এ ক্ষেত্রে তিনি একেশ্বরবাদী, অথচ নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক আবূ হাইয়ানের মানুষের নৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধানে প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে একাধিক ব্যক্তিকে শত্রুতে পরিণত করা সম্ভব; কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী নিবিড় অধ্যবসায় এবং দৃঢ় আনুগত্য ব্যতীত কাউকেও বন্ধু বানানো সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে যৌক্তিক প্রমাণ হলো অবতরণ সর্বদা আরোহণের চেয়ে সহজ এবং মন্দ কাজের প্রতি অগ্রসর হওয়া সর্বদা আল্লাহর পথে সংগ্রামের চেয়ে হালকা।[২]

অতএব, একেশ্বরবাদী দার্শনিকের মানবচরিত্রের বিকাশ সম্পর্কে হতাশাজনক মতামত থেকে এটা পরিষ্কার যে, একজন ব্যক্তির ধ্বংস তার গঠনের চেয়ে সহজ। কারণ নির্মাণ একটি বিধিবদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করে, কিন্তু ধ্বংস বা হত্যার জন্য এমন কোনো ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। এটা কোনো গোপন বিষয় নয় যে, আল-কুরআন মানুষ ও মানবতার জন্য সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং উত্তম পথপ্রদর্শক। কারণ কুরআনই একমাত্র মহাগ্রন্থ, যা পূর্ণাঙ্গ মানবজীবন গঠনের উৎস। এই গ্রন্থই মানবাত্মায় প্রশান্তি, স্থিতিশীলতা, আশাবাদ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার চেতনা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ব্যক্তিত্ব গঠনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বিশ্বের ভয়ের সমস্ত উপকরণ নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছিল। মানুষের ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা, আচরণ সুসংহত ও সুগঠিত করার ক্ষেত্রে ইসলাম শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ও অনুকরণীয় ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষাবিদগণ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, কুরআন মাজীদ সে সম্পর্কে পূর্বেই সম্যক ধারণা দিয়েছে।

অন্যান্য বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, সে বিশ্বাস ধর্মীয় হোক, যেমন- ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান ধর্ম অথবা প্রত্যক্ষবাদ হোক তাদের মতবাদ শিক্ষার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে উপযুক্ত নয়। কারণ তারা জীবনকে একদিক থেকে এবং একটি নির্দিষ্ট কোণ থেকে দেখেন। যেমন- খ্রিষ্টানদের বিশুদ্ধ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি,

---

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. কবি ইবনুর রুমী, আব্বাসীয় যুগ, দিওয়ান.নেট।

২. ড. যাকারিয়া ইবরাহীম, আবূ হাইয়্যান আত-তাওহীদী, পৃ. ৩৮-৩৯।

ইয়াহূদীদের নির্ভেজাল জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মনিরপেক্ষদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যান্য মতামত।[৩]

অতএব, এই পৃথিবীতে সামাজিক ও শিক্ষাগত তত্ত্বের ভিন্নতা এবং শিক্ষাগত বিষয়টিকে এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা মানুষকে তার মৌলিক দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত করে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর সেটা হলো তাদের বিপথগামী এবং অনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সন্তান প্রতিপালন এবং তাদের ধ্বংস থেকে বিরত থাকা, যা অনন্ত জীবন লাভের জন্য একটি সমন্বিত জীবন নির্মাণে সহায়ক উপকরণ।

মানুষের দুঃখ-কষ্টের ক্ষেত্রে আল-কুরআনের দর্শন:

প্রথম উদ্দেশ্য হলো মানব সাধনার সীমারেখা ও পদ্ধতি:

মানুষের নৈতিক গুণাবলি বিশ্বাসগত, আবেগগত এবং স্বেচ্ছাসেবাগত মাত্রায় বিভাজন করা যেতে পারে— যাতে তার কষ্ট ও যন্ত্রণা উপশম হয় এবং ঐ সব প্রতিবন্ধকতা থেকে দূরে থাকতে পারে, যা তাকে মহৎ নৈতিক আদর্শ অবলম্বন এবং আত্মগঠনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার সোপান ঈমান থেকে দূরে রাখে। ইসলাম মানুষ ও মানবতার দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার সমাধান উদ্ভাবন করেছে। তবে বিষয়টি এমন নয় যে, ইসলাম সর্বদা এই একটি কাজই করেছে বা করতে পারে। ইসলামী বিধিবিধানের আলোকে প্রতিটি কাজই মানুষের জন্য কল্যাণকর। তবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সে করে না, কারণ এর জন্য তার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় না এবং তার বিশ্বাস তাকে এই জাতীয় কাজ করতে গুরুতর চিন্তাভাবনার দিকে ঠেলে দেয় না।[৪]

এখান থেকে সাইকিয়াট্রিস্ট হ্যাট্রি লিংক বলছেন, আমরা জীবনের কঠিন সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে পাব না এবং আমরা কেবল তথ্য ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মাধ্যমে সুখের উৎস খুঁজে পাব না। বিজ্ঞানের উত্থান মানে আত্মা এবং নৈতিক মূল্যবোধের স্তরের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে বিভ্রান্তি এবং বিভ্রান্তির ব্যাধি বৃদ্ধি পায়। অতঃপর লিংক আরও বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি উপাসনালয়ে আবদ্ধ থাকে বা ইবাদতখানায় বারবার গমন করে এবং ধর্মহীন ব্যক্তির চেয়ে অধিক শক্তিশালী ব্যক্তির জীবনকে সুখের উৎস হিসেবে গ্রহণ করে অথবা ইবাদতের নিদর্শনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, তবে মনে করতে হবে যে, সে এমন মহান শক্তির (রবের) সন্ধান লাভ করেছে, যিনি জীবন দানের উৎস। এই শক্তি হলো ঐ আল্লাহর শক্তি, যিনি মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। আর তা হলো আল্লাহ প্রণীত ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ ইলাহী সংবিধান আসমানী কিতাবকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা এবং স্বর্গীয় শিক্ষাকে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা, যা থেকে আমরা ধর্মীয় সত্যের সন্ধান লাভ করি, যা তাদের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সম্মিলিত সমস্ত বিজ্ঞানের চেয়ে উচ্চতর এবং পটভূমির মূল্যায়নের আলোকে যুক্তি বা কার্যকারণ তত্ত্বের চেয়ে শক্তিশালী।[৫] মনস্তত্ত্ববিদ ড. লিংক তার জীবনের প্রথম দিকে নাস্তিক ছিলেন, অতঃপর তিনি ভয়াবহ দুর্যোগের কবলে পড়ে আল্লাহর অস্তিত্বের সন্ধান পান। তারপর তিনি আল্লাহর উপর ঈমান আনেন এবং ইসলামী শিক্ষার আলোকে তার অসুস্থতার চিকিৎসা করেন।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্রের গঠন মানবতার জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যা সমাধানে বিশ্বাসের দুর্বলতা এবং আল্লাহর প্রতি আস্থার অভাব এক ধরনের পর্যায় ক্রমিক আত্মহত্যা। সুইডেন ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশে মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতা এবং দুর্বল বিশ্বাসের কারণে বহু মানুষ আত্মহত্যা করেছে। লক্ষণীয় যে, গত ৩০ বছরে আত্মহত্যার সংখ্যা ৪০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। ঈমানের দুর্বলতা পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে ৬ মাসে প্রাচ্যের একটি ইসলামী দেশে ৩,০০০ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।[৬] উল্লেখ্য, ইসলাম আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছে, তাছাড়া এটি অন্যতম বড় পাপও বটে। ইসলামে যেখানে শরীরকে কষ্ট দেওয়া বা শরীরে ত্রুটি সৃষ্টি করা হারাম, সেখানে আত্মহত্যা কীভাবে বৈধ হতে পারে? আল্লাহর প্রতি দুর্বল বিশ্বাস এবং তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া আত্মহত্যার সবচেয়ে শক্তিশালী অনুঘটক। এই কারণে যখন প্রাচ্যের দেশগুলোর অধিবাসীদের ঈমান অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং তারা আল্লাহর ইবাদতে মত্ত ছিল, তখন আপনি তাদের মধ্যে আত্মহত্যার চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাবেন না।

---

৩. মাওসূবী, আবূ হেশাম আব্দুল মালেক, আসালিবুত তারবিয়াহ ইনদা আহলিল বায়ত, পৃ. ১৯।

৪. মুস্তফা মালাকিয়ান, আক্বলানীয়া ওয়াল মানুবীয়া, অনুবাদ: আব্দুল জব্বার আর-রেফায়ী, পৃ. ১৪৫-৪৬।

৫. ড. হাতেরী লিংকের ইসলামে ফিরে আসা, আহমাদ আমীন, আত-তাকামুল ফীল ইসলাম, ৭/১৮৯-১৯০।

৬. আহমাদ আমীন, আত-তাকামুল ফীল ইসলাম, ৭/১৯১।

ডা. ব্রিল বলেছেন, 'ধার্মিক ব্যক্তি মানসিক অসুস্থতা এবং সমস্ত শারীরিক রোগ যেমন- পেটের পীড়া, হজমের সমস্যা, হৃৎস্পন্দন এবং অন্যান্য মানসিক উদ্বেগ ও আধ্যাত্মিক ব্যাধিগুলোর দ্বারা আক্রান্ত হয় না'।[৭] সমস্যার সমাধানে মহান স্রষ্টার প্রতি মনোনিবেশ না করা এবং বিপদাপদের সময় অনুনয় ও বিনয়ের সাথে স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা না করা আত্মহত্যার বড় দুটি কারণ। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, আমেরিকায় প্রতি ৩৫ মিনিটে একজন আত্মহত্যা করে এবং প্রতি দুই মিনিটে একজন উন্মাদনায় আক্রান্ত হয়।[৮]

সুতরাং অন্যায় ও দুর্নীতি দূর করা এবং ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কুরআনের তত্ত্বের নৈতিক মাত্রা এবং ইসলামী বিশ্বাসে এর সত্যতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও মানবিক ও চারিত্রিক মূলনীতির আদর্শ বিবর্জিত নীতিমালা যেমন পশ্চাদপসরণ থেকে মুক্ত নয়, তেমনি কেবল চারিত্রিক মূলনীতি সমাজের সুখ এবং সমাজকে অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে কোনো অবদান রাখতে পারে না। যতক্ষণ না এটি এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সমগ্র বিশ্বে একজন মাত্র ইলাহ আছেন, যার ক্ষমতার উপর কেউই জয়ী হতে পারে না। তিনি সকল বস্তুকে সম্পূর্ণ সিস্টেমের আওতায় তৈরি করেছেন ইলাহী ক্ষমতার বিচারে যার প্রতি তিনি মুখাপেক্ষী নন। সকলকে তিনি তাঁর নিকট ফিরিয়ে আনবেন, তাদের হিসাব নিবেন এবং উপকারকারীকে পুরস্কৃত করবেন এবং নির্যাতনকারীকে শাস্তি দেবেন। তারপর সত্যবিমুখ বা শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করবে।[৯]

ইচ্ছা ও পছন্দের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, নৈতিকতা একমাত্র জিনিস, যা একজন মানুষকে ইহজাগতিক কাঠামোর বাইরে বের করে আনতে পারে। তার ইচ্ছাশক্তি ও পছন্দ পার্থিব কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর বিপরীতে বিজ্ঞান এবং ইচ্ছাহীন অনুভূতি তাকে বিশ্বে বিলুপ্তির বৃত্ত থেকে বের করে আনতে পারে না। কারণ ইচ্ছা ও পছন্দই সিদ্ধান্ত নেয় সে কী করবে? দেহ, মন বা আত্মার কর্মের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব থাকতে পারে। নীতিবানদের নিকট এটাই বড় রহস্যের বিষয়। সত্য উপলব্ধির পরীক্ষা বর্তমানেও চলমান আছে, এ পরীক্ষা পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে চলমান ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾

'তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমরা অনায়াসে জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মতো কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা প্রকম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথী মুমিনগণ বলেছিলেন, কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? জেনে রেখো! নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী' *(আল-বাক্বারা, ২/২১৪)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ 'দ্বীনের মধ্যে জবরদস্তির অবকাশ নেই, নিশ্চয় হেদায়াত গোমরাহী হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি মিথ্যা মা'বূদদেরকে (ত্বাগূতকে) অমান্য করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল; যা ছিন্ন হওয়ার নয়— আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞাত' *(আল-বাক্বারা, ২/২৫৬)*।

উক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, ইচ্ছাশক্তি সকল প্রভাব থেকে স্বাধীন।

মানুষের ইচ্ছাশক্তি তার আত্মার মধ্যে তাক্বওয়ার উপাদান গড়ে তোলা; আদর্শ, মূল্যবোধ ও মহান লক্ষ্যকে মূর্ত করে তোলা এবং জীবন সম্পর্কে তাকে প্রকৃত উপলব্ধি প্রদান করা তার ইচ্ছাশক্তির কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ 'আল্লাহর রাস্তায় যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তাদের পালনকর্তার কাছে তারা জীবিত থাকবে' *(আলে ইমরান, ৩/১৬৯)*। এই আয়াতে শহীদদের মর্যাদা ও তাদের উঁচু সম্মানের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর যুগে মদ্যপানের উপর আল-কুরআনের নিষেধাজ্ঞা মুসলিমদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, সাধারণভাবে প্রত্যেকেই এটি পান করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং তারা মানবতাকে অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

৭. আহমাদ আমীন, আত-তাকামুল ফীল ইসলাম, ৭/১৯৩।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. মুহাম্মাদ হুসাইন আত্বত্বাবাই, আল-মীযান ফী তাফসীরিল কুরআন, ১১/১৫৯-১৬০।

ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান

*-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী**

(পর্ব-২)

দাড়িবিহীন বড়দের দিকে তাকানো যাবে কিনা?

আমরা আগেই দেখে এসেছি যে, কামভাবের সাথে বা ফেতনার ঝুঁকি থাকলে অথবা কামভাব সৃষ্টি হতে পারে এমন সন্দেহ থাকলে দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাবে না। এমনকি কেউ কেউ এসব অবস্থা থেকে মুক্ত থাকলেও না তাকানোর পক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছেন। শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকদের দিকে সব ধরনের তাকানোর ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন এভাবে—

وَكُلُّ قِسْمٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ مَتَى كَانَ مَعَهُ شَهْوَةٌ كَانَ حَرَامًا بِلَا رَيْبٍ سَوَاءٌ كَانَتْ شَهْوَةُ تَمَتُّعٍ بِالنَّظَرِ أَوْ كَانَ نَظَرًا بِشَهْوَةِ الْوَطْءِ.

‘তাকানোর এই সবগুলো প্রকারের সাথে যখনই কামভাব বিদ্যমান থাকবে, তখনই তা সন্দেহাতীতভাবে হারাম হয়ে যাবে— সেটা চোখের মজা নেওয়ার কামভাব হোক বা যৌন কামভাব হোক কোনো পার্থক্য নেই’।[১]

তারপর তিনি দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকদের দিকে তাকানোকে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের হুকুম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

فَصَارَ النَّظَرُ إِلَى المردان ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا مَا تَقْتَرِنُ بِهِ الشَّهْوَةُ. فَهُوَ مُحَرَّمٌ بِالِاتِّفَاقِ. والثَّانِي مَا يُجْزَمُ أَنَّهُ لَا شَهْوَةَ مَعَهُ. كَنَظَرِ الرَّجُلِ الْوَرِعِ إلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ وَابْنَتِهِ الْحَسَنَةِ وَأُمِّهِ الْحَسَنَةِ فَهَذَا لَا يَقْتَرِنُ بِهِ شَهْوَةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مِنْ أَفْجَرِ النَّاسِ وَمَتَى اقْتَرَنَتْ بِهِ الشَّهْوَةُ حَرُمَ... وَإِنَّمَا وَقَعَ النِّزَاعُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ النَّظَرِ وَهُوَ النَّظَرُ إلَيْهِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ؛ لَكِنْ مَعَ خَوْفِ ثَوَرَانِهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد أَصَحُّهُمَا وَهُوَ الْمَحْكِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. والثَّانِي يَجُوزُ.

‘দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকদের দিকে তাকানো ৩ ভাগে বিভক্ত— (১) তাকানোর সাথে কামভাব যুক্ত থাকা। এ প্রকার তাকানো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। (২) দ্বিতীয় প্রকার এমন তাকানো, যার সাথে কামভাব যুক্ত নেই মর্মে নিশ্চয়তা আছে। এই প্রকারের তাকানো জায়েয। যেমন- কোনো পরহেযগার ব্যক্তি কর্তৃক তার সুদর্শন ছেলে এবং সুদর্শনা মেয়ে ও মায়ের দিকে তাকানো। এই তাকানোতে সাধারণত কোনো প্রকার কামভাব যুক্ত হয় না। অবশ্য, ব্যক্তি নিকৃষ্টতম হলে এখানেও কামভাব যুক্ত হতে পারে। যাহোক, যখনই কামভাব যুক্ত হবে, তখনই এই প্রকার তাকানোও হারাম হয়ে যাবে। (৩) কামভাব ছাড়াই তাকানো, তবে এর সাথে কামভাব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই তৃতীয় প্রকার নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটে গেছে। ইমাম আহমাদের মাযহাবে এ ব্যাপারে দু’টি মত পাওয়া যায়। বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে, এই প্রকার তাকানোও নাজায়েয। ইমাম শাফেঈ ও অন্যদের থেকেও এই মতই পাওয়া যায়’।[২]

কাতারভিত্তিক বিশ্বখ্যাত ফতওয়ার ওয়েবসাইট ইসলাম ওয়েব-এর একটি ফতওয়ায় এসেছে, ‘দাড়ি মুণ্ডনকারী ব্যক্তির দিকে তাকালে যদি ফেতনার দিকে ঠেলে দেয়, তাহলে তাকানো হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে দাড়ি মুণ্ডনকারী ব্যক্তি দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক ও বেগানা নারীর মতোই বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি দাড়ি মুণ্ডনকারী নাও হয়, কিন্তু তার দিকে তাকালে ফেতনা হয়, তাহলে ফেতনার রাস্তা বন্ধ করার জন্য তার দিকেও তাকানা জায়েয নেই। তার মানে এই নয় যে, যে কেউ সুন্দর হলেই তার দিকে তাকানো যাবে না। বরং তাকানো তখনই হারাম হবে, যখন তাকালে চোখের স্বাদ নেওয়া হবে বা ফেতনায় পড়ার আশঙ্কা থাকবে। আর এটা আসলে দৃষ্টিদানকারীর বিবেচনায় বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন- পিতা-মাতা তার দাড়িবিহীন সুন্দর ছেলে বা মেয়ের দিকে তাকালে সাধারণত তিনি ফেতনার আশঙ্কা করেন না’।[৩]

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, ১৫/৪১৭।

২. মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, ১৫/৪১৭-৪১৯।

৩. দ্রষ্টব্য: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/111329

সুতরাং এখানকার মূল বিষয়টা হচ্ছে, কামভাব তৈরি হওয়া বা কামভাব তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকা অথবা ফেতনায় নিপতিত হওয়া। কার দিকে বা কীসের দিকে তাকানো হচ্ছে, সেটা সব সময় মূল বিষয় নয়। যার দিকে তাকালে উল্লিখিত ঝুঁকিগুলো বিদ্যমান থাকতে পারে, তার দিকেই তাকানো যাবে না। সেজন্য, দাড়িযুক্ত বা দাড়িমুক্ত যেকোনো শিশু, কিশোর, তরুণ, যুবক বা অন্য যে কারও দিকে তাকালে যদি এসব আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাদের দিকে তাকানো যাবে না।

দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকদের সাথে মুছাফাহা করার বিধান:
ইতঃপূর্বে আমরা জেনে এসেছি যে, কামভাবসহ বা কামভাব জাগ্রত হওয়ার ও ফেতনা সৃষ্টি হওয়ার শঙ্কাসহ দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকের দিকে তাকানো হারাম। এমনকি কামভাব জাগ্রত হতে পারে এমন সন্দেহ থাকলেও তাকানো হারাম।

আর এটা খুব স্বাভাবিক কথা যে, যার দিকে তাকানো হারাম, তার সাথে মুছাফাহা ও কোলাকুলি করা আরও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হারাম। কেননা দৃষ্টি দেওয়ার চেয়ে মুছাফাহা ও কোলাকুলি করা আরও বেশি মারাত্মক। অতএব, উল্লিখিত অবস্থাসমূহে দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকের সাথে মুছাফাহা ও ওঠাবসা করা যাবে না। এ সম্পর্কে কয়েকটি মারফূ‘ বর্ণনা পাওয়া যায়, যেগুলোর বিশুদ্ধতা নিয়ে কথা থাকলেও এর পক্ষে বেশ কিছু শাহেদ বা সমর্থক বর্ণনা ও আছার আছে; তাছাড়া ইসলামী শরী‘আতের সামগ্রিক মূলনীতিও সেগুলোকে সমর্থন করে। একজন তাবেঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, مَا أَنَا بِأَخْوَفَ عَلَى الشَّابِّ النَّاسِكِ مِنْ سَبُعٍ ضَارٍّ مِنَ الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ يَقْعُدُ إِلَيْهِ ‘একজন ধার্মিক যুবকের জন্য কিশোর-তরুণকে আমি ক্ষতিকর হিংস্র প্রাণীর চেয়েও বেশি ভয়ংকর মনে করি, যে কিশোর-তরুণের সাথে সে ওঠাবসা করে’।[৪] একজন তাবে‘-তাবেঈ হাসান ইবনু যাকওয়ান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, لَا تُجَالِسُوا أَوْلَادَ الْأَغْنِيَاءِ، فَإِنَّ لَهُمْ صُوَرًا كَصُوَرِ النِّسَاءِ، وَهُمْ أَشَدُّ فِتْنَةً مِنَ الْعَذَارَى ‘আপনারা বড়লোকের সন্তানদের সাথে ওঠাবসা করবেন না। কারণ তাদের চেহারা মেয়েদের চেহারার মতো। তারা কুমারী মেয়ের চেয়েও বেশি ফেতনাময়’।[৫] মারদাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَالْمَنْقُولُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: كَرَاهَةُ مُجَالَسَةِ الْغُلَامِ الْحَسَنِ الْوَجْهِ ‘ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, সুন্দর চেহারার কিশোরের সাথে ওঠাবসা করা মাকরূহ’।[৬] ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْذَرَ مِنْ مُصَافَحَةِ الْأَمْرَدِ الْحَسَنِ ‘দাড়িবিহীন সুশ্রী কিশোর-যুবকের সাথে মুছাফাহা করা থেকে সতর্ক থাকা উচিত’।[৭] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, النَّظَرُ إِلَى الْأَمْرَدِ لِشَهْوَةٍ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ إِلَى ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَمُصَافَحَتُهُمْ وَالتَّلَذُّذُ بِهِمْ ‘মুসলিমদের ইজমার ভিত্তিতে দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকের দিকে কামভাবসহ তাকানো হারাম। অনুরূপভাবে মাহরাম নারীর দিকে কামভাবসহ তাকানোও হারাম। তাদের সাথে মুছাফাহা করা ও তাদের মাধ্যমে স্বাদ নেওয়াও হারাম’।[৮] তিনি আরও বলেন, وَالتَّلَذُّذُ بِمَسِّ الْأَمْرَدِ كَمُصَافَحَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ: حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا يَحْرُمُ التَّلَذُّذُ بِمَسِّ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ بَلْ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ إِثْمًا مِنَ التَّلَذُّذِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ ‘মাহরাম নারী ও বেগানা নারীকে স্পর্শ করার মাধ্যমে স্বাদ গ্রহণ করা যেমন হারাম, তেমনিভাবে মুছাফাহা বা অন্য কোনোভাবে দাড়িবিহীন কিশোর-যুবককে স্পর্শ করার মাধ্যমে স্বাদ গ্রহণ করাও মুসলিমদের ইজমার ভিত্তিতে হারাম। বরং অধিকাংশ আলেমের দৃষ্টিতে, এটা বেগানা নারীর মাধ্যমে স্বাদ নেওয়ার চেয়েও বড় পাপ’।[৯]

সম্মানিত পাঠক! আপনি প্রথম শুনে থাকলে নিশ্চয় আশ্চর্য হবেন যে, দাড়িবিহীন কিশোর-যুবককে কামভাবসহ স্পর্শ করলে ওযূ ভেঙে যাবে মর্মে উলামায়ে কেরামের জোরালো মত রয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ এ সম্পর্কিত দু’টি মত উল্লেখ করার পর ওযূ ভেঙে যাওয়ার

৪. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান, আছার নং ৫০১৩।

৫. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান, আছার নং ৫০১৪।

৬. আল-মারদাবী, আল-ইনছাফ ফী মা‘রিফাতির রজিহ মিনাল খিলাফ (দারু এহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ২য় মুদ্রণ, তা. বি.), ৮/২৯।

৭. নববী, আল-মাজমূ শারহুল মুহাযযাব (দারুল ফিকর, তা. বি.), ৪/৬৩৫।

৮. ইবনু তাইমিয়াহ, মুখতাছারুল ফাতাওয়া আল-মিছরিয়্যাহ (মাতবা‘আতুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ), পৃ. ২৯।

৯. মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, ২১/২৪৫।

মতটিকে প্রাধান্য দেন এবং এভাবে মন্তব্য করেন, وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ 'প্রথম মতটিই বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য'।[১০]

চিন্তা করতে পেরেছেন, আমাদের কতটা সাবধান থাকতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

কিশোর-যুবকদের সাথে নির্জনে যাওয়ার বা থাকার বিধান:

প্রিয় পাঠক! আপনি যদি এই লেখাটি প্রথম থেকে পড়ে থাকেন, তাহলে কিশোর-যুবকদের সাথে নির্জনে যাওয়ার বা থাকার বিধান অনুমান করতে পারার কথা। জি, আপনার অনুমানই ঠিক। কিশোর-যুবকদের সাথে নির্জনে যাওয়া বা থাকা যাবে না। বরং শাফেঈ ও হাম্বালী মাযহাবে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাক বা না থাক শর্তহীনভাবে তাদের সাথে নির্জনে যাওয়া যাবে না মর্মে বক্তব্য এসেছে।[১১] হাম্বালী মাযহাবে ইলম ও আদব শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেও তাদের সাথে নির্জনে থাকা যাবে না মর্মে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে। অতএব, যার ব্যাপারে জানা যাবে যে, এসব কিশোর-তরুণকে ভালোবাসে বা তাদের সাথে বিশেষভাবে ওঠাবসা করে, তাকে পাঠদান থেকে সরিয়ে দিতে হবে।[১২]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, وَأَمَّا الْخَلْوَةُ بِالْأَمْرَدِ، فَأَشَدُّ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ، لِأَنَّهَا أَفْحَشُ وَأَقْرَبُ إِلَى الشَّرِّ، وَسَوَاءٌ مَنْ خَلَا بِهِ مَنْسُوبٌ إِلَى الصَّلَاحِ أَوْ غَيْرِهِ 'দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকের দিকে তাকানোর চেয়ে তার সাথে নির্জনে যাওয়া বা থাকা বেশি মারাত্মক। কারণ এটা বেশি জঘন্য ও অকল্যাণের বেশি নিকটবর্তী। নির্জনে যাওয়া সেই লোকটি সৎ হোক বা অন্য কিছু হোক'।[১৩] তিনি আরও বলেন, وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْخَلْوَةَ بِالْأَمْرَدِ الْأَجْنَبِيِّ الْحَسَنِ كَالْمَرْأَةِ فَتَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِهِ حَيْثُ حَرُمَتْ بِالْمَرْأَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي جَمْعٍ مِنَ الرِّجَالِ الْمَصُونِينَ 'অগ্রাধিকারযোগ্য মত হচ্ছে, বাইরের[১৪] সুশ্রী কোনো দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকের সাথে নির্জনে যাওয়া মেয়েদের সাথে নির্জনে যাওয়ার মতোই। অতএব, কোনো নারীর সাথে নির্জনে যাওয়া যেমন হারাম, দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকের সাথে নির্জনে যাওয়াও তেমনি হারাম। তবে রক্ষণশীল একদল পুরুষের উপস্থিতিতে তার সাথে থাকলে সেটা ভিন্ন বিষয়'।[১৫]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, أَمَّا صُحْبَةُ المردان عَلَى وَجْهِ الِاخْتِصَاصِ بِأَحَدِهِمْ -كَمَا يَفْعَلُونَهُ- مَعَ مَا يَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ مِنَ الْخَلْوَةِ بِالْأَمْرَدِ الْحَسَنِ وَمَبِيتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَهَذَا مِنْ أَفْحَشِ الْمُنْكَرَاتِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَعِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ 'দাড়িবিহীন কিশোর-যুবককে সঙ্গ দেওয়া—যেমনটা অনেকেই করে থাকে; বিশেষভাবে তার সাথে নির্জনে যাওয়া, কোনো পুরুষের সাথে কিশোর-যুবকের রাত্রিযাপন করা ইত্যাদি মুসলিমদের নিকট, ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের নিকট এবং অন্যদের নিকট অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ'।[১৬]

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, لَا تَجُوزُ الْخَلْوَةُ بِالْأَمْرَدِ، وَلَوْ بِقَصْدِ التَّعْلِيمِ؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَكَمْ مِنْ أُنَاسٍ كَانُوا قَتْلَى لِهَذَا الْأَمْرَدِ، فَأَصْبَحُوا فَرِيسَةً لِلشَّيْطَانِ وَالْأَهْوَاءِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهَا 'পাঠদানের উদ্দেশ্যে হলেও দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকদের সাথে নির্জনে থাকা জায়েয নেই। কেননা শয়তান আদমসন্তানের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়। কত মানুষ যে এই কিশোর-যুবকদের পেছনে পড়ে মরেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এভাবে তারা শয়তান ও প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এই ব্যাপারটিতে সতর্ক হওয়া আবশ্যক'।[১৭]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

---

১০. ইবনু তাইমিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ: ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.), ১/২৮২।

১১. দ্রষ্টব্য: ইবনু মুফলেহ, আল-ফুরূ' (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম মুদ্রণ: ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), ৮/১৯০।

১২. প্রাগুক্ত।

১৩. ফাতাওয়ান নাবাবী, পৃ. ৯৯-১০০।

১৪. এখানে বাইরের বলতে যাদের দিকে তাকালে সাধারণত কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না, তাদের বাইরের মানুষ উদ্দেশ্য। যেমন- ঔরসজাত সন্তান, মা, সহোদর বোন প্রমুখের দিকে তাকালে বা নির্জনে থাকলে সাধারণত কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। সুতরাং এধরনের মানুষের বাইরের মানুষই এখানে উদ্দেশ্য।

১৫. আল-মিনহাজ শারহু ছহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, ৯/১০৯।

১৬. মাজমূ'উ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, ১১/৫৪২।

১৭. উছাইমীন, আশ-শারহুল মুমতে' আলা যাদিল মুস্তাক্বনে' (দারুবনিল জাওযী, ১ম মুদ্রণ: ১৪২২-১৪২৮ হি.), ১/২৯৪-২৯৫।

কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ

*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

(মিন্নাতুল বারী-৩য় পর্ব)

[যে হাদীছের ব্যাখ্যা চলছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، ح وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ القَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: أَيْنَ - أُرَاهُ - السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ» قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»]

শব্দ বিশ্লেষণ:

أُرَاهُ - হামযাতে পেশ দিয়ে পড়া বেশি বিশুদ্ধ। যার অর্থ হলো, আমার ধারণা বা আমি মনে করি। তথা হাদীছের বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে ফুলাইহ এখানে সন্দেহ পোষণ করেছেন এই মর্মে যে, আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারী কোথায় বলেছেন, না অন্য কিছু বলেছেন। তথা তিনি এমনটাও বলতে পারতেন যে, প্রশ্নকারী কে? সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম 'কোথায়' বলেছেন না 'কে' বলেছেন এই বিষয়টি সন্দেহ হওয়ায় তিনি বলেন, আমি মনে করি বা আমি ধারণা করি যে, আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রশ্নকারী কোথায়?

وُسِّدَ - ক্রিয়াটি وسادة থেকে এসেছে, যার অর্থ বালিশ। অতীত যুগে রাজা-বাদশাহ যখন তার সিংহাসনে আরোহণ করতেন, তখন সেখানে হেলান দেওয়ার জন্য বালিশ থাকত। সেখান থেকেই নেতৃত্বের জন্য এই ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ফিক্বহী ব্যাখ্যা:

কিতাবুল ইলমের সাথে হাদীছের সম্পর্ক: উপর্যুক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অজ্ঞ ও অযোগ্যদের তার অনুপযুক্ত পদে মূল্যায়ন করা ক্বিয়ামতের আলামত তথা জ্ঞান উঠে যাওয়া ও মূর্খ লোকদের সকল ক্ষেত্রে পদচারণা একটি ঘৃণিত বিষয়। যা প্রমাণ করে যে, জ্ঞানী ও যোগ্য ব্যক্তিগণ ন্যায় ও আমানতের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। সুতরাং উপর্যুক্ত হাদীছ দ্বারাও জ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ফুটে উঠেছে।

প্রশ্নের সাথে উত্তরের সামঞ্জস্যতা:

লোকটি আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করেছেন, ক্বিয়ামত কখন হবে? আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উত্তরে ক্বিয়ামতের কোনো নির্ধারিত সময় না বলে ক্বিয়ামতের আলামত বললেন। এই ধরনের উত্তরকে আরবী বালাগাতশাস্ত্রের ভাষায় বলা হয়— جواب على أسلوب الحكيم বা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির পদ্ধতিতে উত্তর দেওয়া। যেহেতু ক্বিয়ামতের নির্ধারিত সময় কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়, সেহেতু সেই বিষয়ে উত্তর দেওয়ারও কিছু নেই। তবে ক্বিয়ামতের আলামত বলার মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করা যায়। তাই আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ক্বিয়ামতের আলামত উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের উত্তর আল্লাহ তাআলাও দিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ 'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, তারা কী খরচ করবে? আপনি বলে দিন! তোমরা কল্যাণকর যা খরচ করো— তা তোমাদের পিতা-মাতার জন্য, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা কল্যাণকর যা কিছুই করো না কেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহ এই বিষয়ে সম্যক অবগত' *(আল-বাক্বারা, ২/২১৫)*।

উক্ত আয়াতে প্রশ্ন করা হয়েছে, খরচের পরিমাণ বা খরচের ধরন সম্পর্কে আর মহান আল্লাহ উত্তর দিচ্ছেন, কোথায় খরচ করবে সে বিষয়ে। তথা প্রশ্নের সাথে উত্তরের বাহ্যত মিল নেই। মূলত মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ কী খরচ করবে এটা জানার বিষয় নয়। মানুষ তার সাধ্য অনুযায়ী খরচ করবে। তবে মানুষের জানা উচিত সে কোথায় খরচ করবে এবং কার জন্য খরচ করবে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা সেই প্রয়োজনীয় বিষয়ে মানুষকে অবগত করিয়েছেন। মহান আল্লাহ আরও বলেন, ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ 'তারা আপনাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলে দিন, চাঁদ মানুষের এবং হজ্জের জন্য সময় নির্ধারক' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৯)*।

উক্ত আয়াতে জিজ্ঞাসা ছিল, চাঁদ কেন ছোট-বড় হয়? মহান আল্লাহ চাঁদের ছোট-বড় হওয়ার প্রকৃত কারণ উল্লেখ না করে চাঁদের ছোট-বড় হওয়া আমাদের কী উপকারে আসে সেই উত্তর দিয়েছেন। তথা প্রশ্নের সাথে বাহ্যত উত্তরের মিল নাই। মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, চাঁদ কীভাবে বড় ও ছোট হয় তা জানার চেয়ে চাঁদকে মহান আল্লাহ কোন উদ্দেশ্যে ছোট-বড় করেন তা জানা বেশি উপকারী। তাই তিনি প্রয়োজনীয় বিষয়টি উত্তর হিসেবে তুলে ধরেছেন। চাঁদের ছোট-বড় হওয়ার মাধ্যমে মানুষ মাসের সময় নির্ধারণ করতে পারে। যেমন- চাঁদের সাহায্যে হজ্জের সময় নির্ধারিত হয়ে থাকে।

অযোগ্য দায়িত্বশীল ও আমানতের খেয়ানত: উক্ত হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমানত নষ্ট হওয়াকে অযোগ্য লোকের হাতে দায়িত্ব দেওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। যখনই অযোগ্য লোকেরা দায়িত্ব পাবে, তখনই আমানত নষ্ট হয়ে যাবে তথা আমানত নষ্ট হওয়ার বিষয়টি শুধু অর্থনৈতিক নয়; বরং ব্যাপক অর্থবোধক। দায়িত্ব সংক্রান্ত যেকোনো ধরনের

---

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

অন্যায়পরায়ণতা আমানতের খেয়ানত। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ 'নিশ্চয় মহান আল্লাহ তোমাদেরকে আমানত তার যথাযোগ্য হক্বদারের নিকট পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করবে, তখন ন্যায়বিচারের সাথে ফয়সালা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে যে সদুপদেশ প্রদান করেন, তা কত চমৎকার! নিশ্চয় মহান আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(আন-নিসা, ২/৫৮)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য সাক্ষীস্বরূপ ন্যায়ের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে! যদিও তা তোমাদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। তারা ধনী কিংবা গরীব হোক। মহান আল্লাহ তাদের (উভয়ের) অভিভাবক। অতএব, তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না, পাছে তোমরা ন্যায় বিচার করবে না আর যদি তোমরা (সাক্ষ্য) বিকৃত করো অথবা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক অবগত' *(আন-নিসা, ২/১৩৫)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা মহান আল্লাহর জন্য ন্যায়নিষ্ঠতাসহ সাক্ষী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে! কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি তোমাদের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে উদ্বুদ্ধ না করে যে, তোমরা ইনছাফ করবে না। তোমরা ইনছাফ করবে। এটি তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করো! নিশ্চয় মহান আল্লাহ তোমরা যা করো, সে বিষয়ে সম্যক অবগত' *(আল-মায়েদা, ৫/৮)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ 'নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়, সদাচরণ ও নিকটাত্মীয়কে প্রদান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, মন্দ ও সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারো' *(আন-নাহল, ১৬/৯০)*।

উপরের আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করা অন্যতম একটি আমানত। যারা নিজ নিজ দায়িত্বের জায়গা থেকে ন্যায় বজায় রাখতে পারে না, তারা আমানতের খেয়ানত করে। পৃথিবীতে যেদিন অযোগ্য মানুষ দায়িত্বশীল হবে এবং যখন তারা তাদের দায়িত্বের হক্ব আদায় করতে পারবে না, দায়িত্বের জায়গা থেকে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না; তখন সমগ্র পৃথিবীতে অন্যায়-অনাচার ও যুলম ছড়িয়ে পড়বে। মানুষ পশু-প্রাণীর মতো হয়ে যাবে, তখনই মূলত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।

বক্তব্য চলা অবস্থায় কেউ কোনো প্রশ্ন করলে বক্তব্য কি থামানো যাবে?

প্রথমত, উপর্যুক্ত হাদীছ থেকে আমাদের শিক্ষা হচ্ছে, কোনো মানুষ ভিন্ন কোনো কথায় ব্যস্ত থাকলে সেই কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কোনো প্রশ্ন করা উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত, কেউ যদি প্রশ্ন করেই বসে; তাহলে কী করা হবে? উপর্যুক্ত হাদীছে আল্লাহর নবী ﷺ কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার প্রশ্নের দিকে দৃষ্টিপাত করেননি। যা প্রমাণ করে, চলমান কথা চালিয়ে যেতে হবে এবং চলমান কথা শেষ হওয়ার পরেই প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

তৃতীয়ত, অন্যান্য হাদীছকে একত্রিত করলে দেখা যায় বিভিন্ন সময় রাসূল ﷺ নিজেই বক্তব্যের মধ্যে বক্তব্য থামিয়ে প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ».

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একজন ব্যক্তি আগমন করলেন এমন অবস্থায় যে এসময় আল্লাহর নবী ﷺ জুমআর খুৎবা দিচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'হে অমুক! তুমি কি ছালাত আদায় করেছ?' তখন ঐ ব্যক্তি বলল, 'জি, না'। তখন আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, 'দাঁড়াও এবং দুই রাকআত ছালাত আদায় করো'।[১]

উপরিউক্ত হাদীছে আল্লাহর নবী ﷺ চলমান খুৎবা থামিয়ে উক্ত ব্যক্তির সাথে কথা বলেছেন। যা প্রমাণ করে, জরুরী কিছু হলে সাথে সাথে কথা থামিয়েও বলা যায় আর মহান আল্লাহই সবকিছু সম্যক অবগত।

সারমর্ম ও শিক্ষা:

১. প্রশ্নকারীর পরিচয় জেনে উত্তর দেওয়া উচিত। যেমনটি রাসূল ﷺ প্রশ্নকারীর পরিচয় খুঁজে নিয়েছেন।

২. আলেমের ধৈর্য অনেক বড় বিষয়। যেমনটি রাসূল ﷺ উক্ত ব্যক্তিকে কোনো প্রকার তিরস্কার না করে ধৈর্যের সাথে তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

৩. চলমান কথার মধ্যে কোনো কথা না বলা জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি আদব।

৪. উত্তরের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা থাকলে পুনরায় জিজ্ঞেস করে নেওয়া যায়। যেমন উপর্যুক্ত হাদীছে প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন, আমানত কীভাবে নষ্ট হয়ে যাবে?

৫. প্রশ্নকারীর জন্য কোন কথাটি বেশি উপকারে আসবে, সেটি মাথায় রেখে উত্তর দেওয়া। যেমন রাসূল ﷺ ক্বিয়ামতের নির্ধারিত সময় উল্লেখ না করে ক্বিয়ামতের আলামত বলে দিলেন।

৬. রাসূল ﷺ-এর মজলিস সকলের জন্য উন্মুক্ত ও প্রশস্ত ছিল। দ্বীনী মজলিসগুলো এমনই হওয়া উচিত।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

---

১. ছহীহ বুখারী, হা/৯৩০।

যিলহজ্জ মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত

*-মাহবূবুর রহমান মাদানী**

হিজরী সনের দ্বাদশ মাস হলো যিলহজ্জ মাস। এ মাসটি চারটি হারাম মাসের মধ্যে অন্যতম। এ মাসে হজ্জ আদায় করতে হয়। এ মাসের ৮ তারিখ থেকে হজ্জের মূল কার্যক্রম শুরু হয় আর এ মাসেই কুরবানী করতে হয়। এজন্য এই মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত অনেক।

এ মাসের প্রথম ১০ রাত ও দিনের ফযীলত: এ মাসের প্রথম ১০ দিনের আমলের ফযীলত সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ও ছহীহ হাদীছে অনেক আয়াত ও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ 'শপথ! ১০ রাতের' *(আল-ফাজর, ৮৯/২)*। উক্ত ১০ রাত দ্বারা ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা, ক্বাতাদা, মুজাহিদসহ অন্যান্য মুফাসসিরের মতে, যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ রাত বোঝানো হয়েছে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ 'যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের নেক আমল করা আল্লাহর নিকট যত বেশি প্রিয় আর কোনো দিনের আমল তাঁর কাছে তত প্রিয় নয়'। ছাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদও নয়? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে তার জান ও মাল নিয়ে বের হয়ে গেছে; কিন্তু কোনো কিছু নিয়ে আসেনি'।[১]

অতএব, কুরআন ও হাদীছের দলীল দ্বারা জানা গেল যে, যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের আমলসমূহ অন্যান্য দিনের আমলের তুলনায় অধিক উত্তম ও ফযীলতপূর্ণ। এই দিনগুলো হলো ছওয়াব অর্জনের মৌসুম। কাজেই এই সময়ে নফল আমল করার ব্যাপারে সকলকে আগ্রহী হতে হবে এবং পরস্পর প্রতিযোগিতা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾ 'তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে ও জান্নাতের দিকে' *(আলে ইমরান, ৩/১৩৩)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ 'অতএব, সৎকাজে তোমরা প্রতিযোগিতা করো' *(আল-মায়েদা, ৫/৪৮)*।

নফল আমল দ্বারা পরকালে আমলের ওযনের পাল্লা ভারী হবে। যার সৎ আমলের পাল্লা ভারী হবে, সেই তো সফলকাম। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ 'সেদিন সঠিক ওযন করা হবে। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে' *(আল-আ'রাফ, ৭/৮)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, - ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ 'অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে, সে (জান্নাতে) সুখী জীবন যাপন করবে' *(আল-ক্বারিআহ, ১০১/৬-৭)*।

নফল আমলসমূহের গুরুত্ব ও ফযীলত: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ 'মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সঙ্গে দুশমনি রাখবে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু আমার বান্দার ওপর ফরয করেছি, তা দ্বারা আমার বান্দা যতটা আমার নিকটবর্তী হয়, আমার প্রিয় আর কোনো কিছুর দ্বারা ততটা নিকটবর্তী হতে পারে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোনো কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। যদি সে আমার কাছে (কোনো কিছু থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি কোনো কাজ করতে চাইলে তা করতে কোনো দ্বিধা করি না, যতটা দ্বিধা করি মুমিন বান্দার প্রাণ নিতে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে কষ্ট দিতে অপছন্দ করি'।[২]

---

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৮; তিরমিযী, হা/৭৫৭, হাদীছ ছহীহ।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫০২।

এই দিনগুলোতে যেসব নফল আমল বেশি বেশি করা যায়:

বেশি বেশি যিকির-আযকার করা: যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠা থেকে শুরু করে ১৩ তারিখের আছরের ছালাত আদায় পর্যন্ত যিকির, তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করা। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা এই দিনগুলোতে বেশি বেশি করে তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার) এবং তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) পাঠ করো'।[৩] আর এগুলো সর্বস্থানে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ও উঁচু আওয়াজেও পড়া যায়।[৪]

কিছু গুরুত্বপূর্ণ দু'আ, যা দৈনন্দিন নিয়মিত পড়া যায়:

(১) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই দু'আটি কোনো এক গ্রাম্য লোককে নিয়মিত পড়ার জন্য শিখিয়ে দেন।[৫]

(২) ওযন ভারী করার জন্য سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ গুরুত্বপূর্ণ এই দু'আটি পড়া।[৬]

(৩) ভালো কাজে অগ্রগামী হওয়ার জন্য سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর সবগুলোই ৩৩ বার করে পড়া।[৭]

(৪) سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ (দিনে ১০০ বার পড়া)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার বলবে, তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে- যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়'।[৮]

(৫) জান্নাতের ধনভাণ্ডার لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ যিকিরটি পড়া।[৯]

(৬) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (দিনে ১০০ বার পড়া)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে এই যিকিরটি ১০০ বার পড়বে, সে ১০টি গোলাম মুক্ত করার ছওয়াব লাভ করবে এবং তার জন্য ১০০ নেকী লেখা হবে আর তার ১০০ গুনাহ মাফ করা হবে। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা তার জন্য রক্ষাকবচ হবে এবং তার চেয়ে অধিক ছওয়াব আর কারো হবে না। তবে সে ব্যক্তি ছাড়া, যে এ আমল তার চেয়েও অধিক করবে'।[১০]

(৭) দুটি বাক্য যা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়, উচ্চারণে হালকা, দাঁড়িপাল্লায় ভারী। তা হলো, سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ পড়া।[১১]

(৮) আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য চারটি তথা سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ পড়া।[১২]

(৯) আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে বেশি পঠিতব্য দু'আ তথা سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ পড়া।[১৩]

ক্ষৌরকর্ম থেকে বিরত থাকা: এ মাসের চাঁদ উঠার পর থেকে কুরবানী করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি চুল, নখ, লোম ইত্যাদি কাটা থেকে বিরত থাকবে।[১৪]

এই দিনগুলোতে ফরয ছালাত সঠিকভাবে আদায়ের সাথে সাথে নফল ছালাতগুলো আদায় করা: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ 'ফরয ছালাতের পর সর্বোত্তম ছালাত হলো রাতের তাহাজ্জুদের ছালাত'।[১৫] রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ 'মানুষ যখন ঘুমিয়ে যায়, তখন ছালাত আদায় করো, নিরাপদে জান্নাতে যাবে'।[১৬] এটা ছাড়াও ছালাতুল ইশরাক ও ছালাতুয যুহা আদায় করা।

ছিয়াম পালন করা: এ মাসের শুরু থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত নফল ছিয়াম রাখা উত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কোনো এক স্ত্রী বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ পর্যন্ত ছিয়াম রাখতেন।[১৭] আমর ইবনে আবাসা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعُدَتْ مِنْهُ النَّارُ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন মাত্র ছিয়াম রাখবে, সেই ব্যক্তি থেকে জাহান্নাম ১০০ বছরের পথ পরিমাণ দূরে সরে যাবে'।[১৮] অন্য হাদীছে ৭০ বছরের কথাও বলা হয়েছে।[১৯]

---

৩. আহমাদ, হা/৬১৫৪।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৯৬৯।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৬।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭২৬।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৮৪৩।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪০৫।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪০৯।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪০৩।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৬৩।
১২. ছহীহ মুসলিম, হা/২১৩৭।
১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৮৪।
১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৭।
১৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৩।
১৬. ইবনু মাজাহ, হা/১৩৩৪, হাদীছ ছহীহ।
১৭. আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৭, হাদীছ ছহীহ।
১৮. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৯৮৮; আল-মু'জামুল আওসাত, হা/৩২৪৯।
১৯. ছহীহ বুখারী, হা/২৮৪০; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৩।

যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে আরাফার দিনের ছিয়াম রাখার ফযীলত: আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالَّتِي بَعْدَهُ 'আমি আল্লাহর নিকট আরাফা দিবসের ছিয়ামের ছওয়াব আশা করি যে, তিনি তার বিনিময়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন'।[২০]

ছাদাক্বা করা: এই দিনগুলোতে বেশি বেশি ছাদাক্বা করা, যদিও তা পরিমাণে কম হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ 'তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার বিনিময় দেবেন আর তিনি উত্তম রিযিক্বদাতা' *(সাবা, ৩৪/৩৯)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ 'তোমরা যা কিছু ধনসম্পদ দান করো, তা নিজেদের জন্যই। আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তোমরা দান করো না আর তোমরা যা দান করো, তার পুরস্কার পরিপূর্ণভাবে প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলম করা হবে না' *(আল-বাক্বারা, ২/২৭২)*। আবি ইবনে হাতিম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ 'তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো, যদিও খেজুরের এক টুকরো ছাদাক্বা করে হয়'।[২১] আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالُوا: وَكَيْفَ؟ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا، وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُرْضِ مَالِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا 'এক দিরহাম এক লক্ষ দিরহাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'। এক ব্যক্তি বললেন, তা কী করে হয়, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি বললেন, 'এক ব্যক্তির প্রচুর মাল আছে, সে তার এক অংশের দিকে যায় অতঃপর এক লক্ষ দিরহাম দান করে আর অন্য এক ব্যক্তি মাত্র দুই দিরহামের মালিক, সে তা হতেই এক দিরহাম দান করে'।[২২]

বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা এবং তা খতম দেওয়া: মহান আল্লাহ বলেন, (হে রাসূল! বলুন, আমি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি) ﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْءَانَ﴾ 'কুরআন তেলাওয়াত করতে' *(আন-নামল, ২৭/৯২)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনুল মাজীদ-এর একটি বর্ণ পাঠ করবে, তার একটি ছওয়াব হবে আর একটি ছওয়াব ১০টি ছওয়াবের সমান হয়। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি বর্ণ; বরং আলিফ একটি বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মীম একটি বর্ণ'।[২৩] আবূ উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ 'তোমরা কুরআন পাঠ করো। কেননা ক্বিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আগমন করবে'।[২৪]

বেশি বেশি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও দু'আ করা: আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে বলেন, ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব' *(আল-মুমিন, ৪০/৬০)*। তিনি আরও বলেন, ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ 'আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে আহ্বান করে' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৬)*। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ 'দু'আ হলো ইবাদত'।[২৫] তিনি আরও বলেছেন, مَنْ لَمْ يَدْعُ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ، غَضِبَ عَلَيْهِ 'যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ডাকে না, তিনি তার ওপর ক্রুদ্ধ হন'।[২৬] তিনি আরও বলেন, إِنَّ اللّٰهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক লজ্জাশীল ও সম্মানিত। বান্দা তাঁর দিকে দুই হাত উঠিয়ে কিছু চাইলে বঞ্চিত করে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন'।[২৭]

উপসংহার: পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, যিলহজ্জ একটি মহিমান্বিত ও সম্মানিত মাস। এ মাস আমাদের নিকট ছওয়াবের ফল্গুধারা নিয়ে আগমন করে। আমাদের উচিত এ মাসের যথাযথ মূল্যায়ন করা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

২০. ইবনু মাজাহ, হা/১৭৩০, হাদীছ ছহীহ।
২১. ছহীহ বুখারী, হা/১৪১৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৯৪।
২২. নাসাঈ, হা/২৫২৭; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৮৮৩।
২৩. তিরমিযী, হা/২৯১০, হাদীছ ছহীহ।
২৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৪।
২৫. তিরমিযী, হা/২৯৬৯, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২২৩০।
২৬. ইবনু মাজাহ, হা/৩৮২৭, হাসান।
২৭. তিরমিযী, হা/৩৫৫৬, হাদীছ ছহীহ।

ডিভোর্সের মূল কারণ ধর্মীয় অজ্ঞতা

*-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী**

বিয়ে হচ্ছে ইসলামী শরীআতের একটি বৈধ চুক্তি, যার মাধ্যমে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মুমিন নর-নারী তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু করেন। এই পারিবারিক এবং ধর্মীয় বন্ধনটি ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একটি সুন্দর ইসলামী পরিবারেই প্রকৃত ইসলামের চর্চা হতে পারে। যে পরিবারে যত বেশি দ্বীনের চর্চা হবে, সেই পরিবার তত বেশি আল্লাহর কাছে প্রিয় হবে।

অথচ বর্তমান সময়ে পরিবারগুলোতে দ্বীনের চর্চা হয় না বললেই চলে। আর তাই এই বিবাহ বন্ধনগুলো খুব বেশি আকারে বিচ্ছেদে রূপ নিচ্ছে। কিন্তু কেন বর্তমান সময়ে অধিক হারে ডিভোর্স হচ্ছে? আমরা যদি বর্তমান সময়ের বিবাহবিচ্ছেদের কারণগুলো অনুসন্ধান করি, তাহলে দেখতে পাব যে, দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে চরম অজ্ঞতাই ডিভোর্সের অন্যতম কারণ। তাহলে আসুন জানার চেষ্টা করি, কীভাবে ইসলামী জ্ঞানের অভাবে দিন দিন আমাদের দেশে বিবাহবিচ্ছেদ মহামারি আকার ধারণ করছে।

বিবাহবিচ্ছেদের বর্তমান পরিসংখ্যান:

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে বিবাহবিচ্ছেদ বা ডিভোর্সের হার আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। এই হার রীতিমতো ভয়াবহ। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ঢাকায় প্রতি ৪০ মিনিটে একটি করে বিবাহবিচ্ছেদ হচ্ছে। ২০২২ সালে শুধু রাজধানী ঢাকায় তালাকের ঘটনা হয়েছে প্রতিদিন গড়ে ৩৭টি করে। প্রতিনিয়ত সারাদেশে বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা বেড়েই চলেছে।

এই বিবাহবিচ্ছেদ হঠাৎ করেই বেড়ে যায়নি। আমরা যদি গত এক যুগের বিবাহবিচ্ছেদের জরিপ দেখি, তাহলে বুঝতে পারব কীভাবে ধীরে ধীরে আমাদের সমাজে এই পারিবারিক নীরব ঘাতক প্রতিটি পরিবারকে গ্রাস করে চলেছে।

একটি জরিপে দেখা যায় যে, ঢাকায় ২০২১ সালে ১৪৬৫৯টি এবং ২০২০ সালে ১২৫১৩টি বিবাহবিচ্ছেদ হয়। ২০২২ সালে চট্টগ্রামে বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে ৫৯৭৬টি। ২০২১ সালে রংপুরে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে ৭২১৫টি। ২০২০ সালে ময়মনসিংহে তালাকের ঘটনা ঘটেছে ৬৩৯০টি।

জরিপে আরও দেখা যায় যে, ঢাকা সিটি করপোরেশনে ২০১২ সালে ডিভোর্সের জন্য আবেদন করা হয়েছিল ৭৪০২টি, ২০১৩ সালে ৭৭০৮টি, ২০১৪ সালে ৯০৪৫টি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৯ সালে প্রতি ঘণ্টায় একটি তালাকের জন্য জন্য আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে সিটি করপোরেশনে। এভাবে চট্টগ্রামে প্রতিদিন গড়ে ১৮টি তালাক হয়।

মোটকথা আজকে আমরা বিবাহবিচ্ছেদের যে ব্যাপক পরিমাণ দেখছি, সেটা মূলত ধীরে ধীরেই আমাদের সমাজে বেড়ে উঠেছে। একটি জাতীয় পত্রিকার পক্ষ থেকে বিবাহবিচ্ছেদের প্রবণতা নিয়ে পরিচালিত একটি জরিপে উঠে এসেছে যে, অধিকাংশ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে মেয়েদের পক্ষ থেকে। তাদের হিসেবে শতকরা ৭০ ভাগ বিচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রীদের পক্ষ থেকে। একইসাথে তালাকের ঘটনা বেশি ঘটছে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারে। জরিপে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে বিবাহবিচ্ছেদের হার বেশি। বিবাহবিচ্ছেদের এসব তথ্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) 'বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস-২০২২' শীর্ষক জরিপ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিবাহবিচ্ছেদের কারণ:

বিভিন্ন কারণে আমাদের সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে থাকে। বিবাহবিচ্ছেদ শুধু পুরুষ কিংবা শুধু নারীর পক্ষ থেকে হয় না; বরং স্বামী-স্ত্রী ছাড়া পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের চাপেও বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে থাকে। নিম্নে আমরা বিবাহবিচ্ছেদের কিছু কারণ খতিয়ে দেখার চেষ্টা করব।

১. পরকীয়া: বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কারণ বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক বা পরকীয়া। তথ্যপ্রযুক্তির কারণে নারী-পুরুষের অবাধ ও সহজ যোগাযোগের ফলে বেড়ে গেছে পরকীয়ার সম্পর্ক। আধুনিক যুগে স্মার্ট ডিভাইসে হাতের আঙুলে চাপ দিলেই পাওয়া যাচ্ছে নর-নারীর সংস্পর্শ। ফলে শয়তানের প্ররোচনা ছাড়াই বিবাহিত নারী-পুরুষ একে অপরের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। ফলশ্রুতিতে পরকীয়ায় জড়িতরা পরবর্তীতে বিবাহবিচ্ছেদের মাধ্যমে নতুন সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যায়।

২. শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন: বিভিন্ন কারণে (যৌতুক, গোঁয়ারতুমি, স্বামীর অবাধ্যতা, বদমেজাজ, জুয়া, মাদকাসক্তি ইত্যাদি) স্বামী কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কারণেও সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।

৩. যৌতুক: সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে বেশিরভাগ সময় যৌতুকের কারণে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

৪. জুয়া ও মাদকাসক্তি: আমাদের দেশে গত এক যুগ ধরে জুয়া ও মাদকাসক্তির প্রবণতা বেড়ে গেছে। ফলে এই জুয়াড়ি ও মাদকাসক্ত স্বামীরা সহজে সুস্থভাবে সংসার করতে পারে না। সেজন্য তাদের সংসারে বিচ্ছেদ ঘটে।

৫. স্বামীর অবাধ্যতা: আমাদের দেশে পুরুষরা খুব কমই ডিভোর্স দিয়ে থাকে। যে কয়েকটি কারণে স্বামীরা ডিভোর্স দিয়ে থাকে, তার অন্যতম হলো স্বামীর অবাধ্যতা। একই সাথে স্ত্রীর অতিরিক্ত আধুনিকতার কারণেও স্বামীরা ডিভোর্স দিয়ে থাকে।

৬. ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা না করা: স্বামী-স্ত্রীর একজন কিংবা উভয়েই ধর্মীয় অনুশাসন না মেনে চলার কারণে সংসারে নানান অশান্তি দেখা দেয়। আর এইসব অশান্তির ফলে একসময় তারা ডিভোর্সের দিকে এগিয়ে যায়।

৭. নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা: বর্তমান সময়ে নারীরা নানান পেশায় জড়িত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে বেশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাদের বৈবাহিক জীবনেও ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। এর ফলে তারা সংসারে মানিয়ে নেওয়ার চাইতে আলাদা থাকাকেই পছন্দ করে বেশি। যে কারণে সংসারে কোনো না কোনো ঝামেলা হলেই এইসব নারীরা ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে ডিভোর্সের দিকে এগিয়ে যায়। এছাড়াও মেয়েদের সেক্যুলার উচ্চশিক্ষা ও নিজেদেরকে পুরুষের সমকক্ষ ভেবে স্বামীকে যথাযথ সম্মান না দেওয়ার কারণেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।

৮. মনোমালিন্য: সংসার জীবনে টুকটাক মনোমালিন্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অনেকেই নিজেদের ধৈর্য ধরে রাখতে পারে না। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সৃষ্ট মনোমালিন্যগুলো একসময় বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৯. পারিবারিক প্ররোচনা: কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পরিবারের সদস্যদের নানান কুটিলতা এবং প্ররোচনাও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের কারণ হয়ে যায়।

১০. পরস্পরের উপর শ্রদ্ধাবোধ না থাকা: সমবয়সী কিংবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য বেশি না হলে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কাজ করে না। ফলে সংসারে খোঁচাখুঁচি শুরু হলে ঐ সংসার আর বেশিদিন টিকে না।

১১. অমতে বিয়ে দেওয়া: মেয়ের অমতে পারিবারিক সিদ্ধান্তে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার ফলেও সংসার ভেঙে যায়।

১২. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দূরত্ব: সংসারের শুরু থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ এবং বনিবনা না হলে ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এছাড়াও দুজনই চাকরিজীবী হলেও নানান কারণে দূরত্ব বেড়ে যায়। আর এই দূরত্বই একসময় বিবাহবিচ্ছেদের দিকে এগিয়ে যায়।

১৩. কর্মজীবী স্বামী-স্ত্রীর ব্যস্ততা: আধুনিক জীবনে স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রীরাও প্রয়োজনে বা শখের বশে কিংবা নিজেকে যাহির করার জন্য হলেও অনেকে চাকরি করে। ফলে পেশাগত ব্যস্ততা ও সাংসারিক কাজ একসঙ্গে সামাল দিতে না পারায় তারা অত্যধিক চাপে পড়ে যায়। তখন স্বামীর সাথে বনিবনা না হলে তারা ডিভোর্সকেই সমাধান হিসেবে বেছে নেয়।

দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা- কীভাবে বিবাহবিচ্ছেদের কারণ:
আমরা যদি বিবাহবিচ্ছেদের কারণগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখতে পাব যে, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ না থাকাটাই ডিভোর্সের মূল কারণ। আমরা যদি আমাদের পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ইসলামের সঠিক শিক্ষার চর্চা করতাম, তাহলে আজ আমাদের দেশে গণহারে ডিভোর্স হতো না।

শুরুতেই যদি আমরা বিবাহবিচ্ছেদের প্রধান কারণ ‘পরকীয়া’ নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, ইসলাম সরাসরি পরকীয়ার বিরোধী। যেনা-ব্যভিচার প্রতিরোধের ব্যাপারে ইসলাম খুবই কঠোর। বিবাহিত নারী কিংবা পুরুষ যদি যেনা-ব্যভিচার বা পরকীয়ায় লিপ্ত হয়, তাহলে তার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড।

যদি পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে ইসলামী আইনের অনুশাসন চলত, তাহলে কোনো বিবাহিত নারী-পুরুষ কখনোই পরকীয়ায় লিপ্ত হওয়ার সাহস পেত না। অথচ আমাদের সমাজে আজ পরকীয়ায় লিপ্ত হওয়া নারী-পুরুষের অভাব তো নেই, বরং উল্টো বাড়ছে।

আর এই পরকীয়া বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো, ধর্মীয় জ্ঞান না থাকা এবং তা প্রতিপালন না করা। একজন মুসলিম নারী বা পুরুষ যদি জানত পরকীয়ার ইসলামী শাস্তি কী এবং পরকীয়ায় জড়িতদের রাষ্ট্র দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিচ্ছে, তাহলে কেউ সহজে এই পাপে নিজেকে জড়িত করত না।

একইভাবে যৌতুকের কারণে অসংখ্য সংসার ভেঙে যায়। অথচ এই যৌতুক প্রথা সরাসরি হিন্দুদের থেকে আগত। ইসলামে যৌতুকের কোনো সুযোগ নেই। ইসলাম নারীদের সম্মান দিয়েছে এবং কন্যা সন্তানের পিতা-মাতাকে দিয়েছে

জান্নাতের সুসংবাদ। আমাদের দেশে কন্যা সন্তানের পিতা-মাতার কাছে যৌতুকের জন্য দুনিয়াটা হয়ে যায় জাহান্নাম।

ইসলাম বলে, যে বিয়েতে খরচ কম হয়, সেই বিয়ে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়; অথচ আমাদের দেশে বিয়েতে কে কত খরচ করতে পারে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এই প্রতিযোগিতায় বাধ্য হয়ে গরিবদেরও অংশগ্রহণ করতে হয়। ফলে যৌতুক দিতে গিয়ে আজ হাজারো কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবার পথের ফকীরে পরিণত হচ্ছে।

এ থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, যদি ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সঠিক জ্ঞান থাকত, তাহলে কখনোই তারা যৌতুকের মতো বিধর্মী কালচার চর্চা করত না এবং এর কারণে সংসারও ভাঙত না।

এছাড়াও স্বামী জুয়াড়ি ও মাদকাসক্ত থাকার কারণে অসংখ্য সংসার ভেঙে যায়। বিয়ে হওয়ার আগে পারিবারিকভাবে ছেলেকে যাচাই-বাছাই করা হলেও, মোটামুটি বিত্তশালী জুয়াড়ি কিংবা মাদকাসক্ত ছেলের ব্যাপারে কনেপক্ষের নমনীয়তার ভাব লক্ষ্য করা যায়।

অথচ ইসলামে জুয়াসহ যাবতীয় মাদক (বিড়ি, সিগারেট, তামাক, জর্দা ইত্যাদি) হারাম। মানুষ দুনিয়াবী লোভে পড়ে টাকা-পয়সা দেখে এমন হারামখোর ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে কিছুদিন পরেই দেখা দেয় সংসারে অশান্তি। পরবর্তীতে স্বামীর জুয়া আর মাদক কেনার টাকাও দিতে হয় কনেপক্ষকে। যখন সহ্যের সীমা পেরিয়ে যায়, তখন শেষমেশ ডিভোর্সই হয় তাদের শেষ ভরসা।

এছাড়াও আধুনিক মেয়েদের উচ্চশিক্ষা কিংবা পারিবারিক সুশিক্ষা না থাকাও অধিকাংশ বিবাহবিচ্ছেদের কারণ হিসেবে দেখা যায়। একইসাথে স্বামীর অবাধ্যতা, স্বামী-স্ত্রীর মতের অমিল, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব ইত্যাদি তো আছেই। অথচ ইসলামের সঠিক অনুসরণ করলে কখনোই এইসব সমস্যার উদ্ভব হতো না।

ইসলাম বলে সংসারের কর্তৃত্ব থাকবে স্বামীর। তবে তা কখনোই স্ত্রীর ওপর জবরদস্তিমূলক নয়। স্ত্রী স্বামীর বাধ্যগত থাকবে, তবে স্ত্রীর মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কখনোই স্ত্রীকে হেয় প্রতিপন্ন কিংবা ছোট করা যাবে না।

সুতরাং আমরা যদি সংসারে ইসলামের চর্চা করি, তাহলে কখনোই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিদ্বেষ, কোন্দল, অশ্রদ্ধা ইত্যাদি তৈরি হবে না, যার কারণে তাদের ডিভোর্স হতে পারে। এছাড়াও স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য এক মহান শিক্ষা রেখে গিয়েছেন।

যদি সুন্নাহর অনুসরণ করে প্রতিটি স্বামী তার স্ত্রীকে সম্মান ও গুরুত্ব দিয়ে সংসারে সাহায্য-সহযোগিতা করত, তাহলে সংসারে কখনোই অশান্তি সৃষ্টি হতো না। একটি সংসারে ভুল বোঝাবুঝি তখনই সৃষ্টি হয়, যখন একে অপরের থেকে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা উঠে যায়। আর শয়তান তখনই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়, যখন সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।

যে কারণে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি বা মনোমালিন্য হলেই আমাদের সংসারগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। আমরা যদি সংসারে সত্যিকারের শান্তি বজায় রাখতে চাই, তাহলে আমাদের অনুসরণ করতে হবে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী। যিনি দেশও পরিচালনা করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন আবার উত্তমভাবে সংসারও সামলেছেন। সুতরাং ইসলামের আলোকে নারীকে সম্মান দিয়ে তার সুখ-দুঃখে পাশে থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করে সংসার করলে, সেই সংসারে সহজে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।

আরেকটি কারণ যা আমাদের সুন্দর সংসারগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে তা হচ্ছে, পারিবারিক প্ররোচনা। একজন নববধূ যখন একটি নতুন সংসারে প্রবেশ করে, তখন ঐ পরিবারের মানুষ ও পরিবেশ সবকিছুই তার কাছে নতুন। তাকে ঐ নতুন পরিবেশে টিকে থাকতে হলে সকলের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন।

যখন একজন নববধূ তার সংসারে প্রাপ্য সম্মান পায় না, তখন সে নিজ পরিবারের কাছে ছুটে যায় সাহায্যের আশায়। তখনই শয়তানের চক্রান্ত শুরু হয়। দোষ যারই থাকুক না কেন, তখন দুই পরিবারের মধ্যে এক অলিখিত যুদ্ধ শুরু হয়। যে যুদ্ধের ইন্ধনদাতা স্বয়ং ইবলীস শয়তান।

ইসলাম বলে, যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে হবে সুন্নাহসম্মত পদ্ধতিতে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা হলো স্ত্রীর সাথে যদি সমস্যা হয়, তাহলে তাকে উপদেশ দেওয়া, তাতে কাজ না হলে বিছানা আলাদা করা, তাতেও কাজ না হলে হালকা প্রহার করা, প্রয়োজনে উভয় পরিবার বসে সেটার সমাধান করা।

কিন্তু যখনই কোনো সংসারের মধ্যে ঝামেলা সৃষ্টি হয়, তখনই কিছু মানুষ আগুনে ঘি ঢালার চেষ্টা করে। এরা আমাদের পরিবারেরই লোক। আল্লাহ যেখানে বলেন, তোমরা ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করো, এতে রয়েছে কল্যাণ। সেখানে আমাদের সংকীর্ণ জ্ঞানের কারণে আমরা সংসারগুলোতে বিবাহবিচ্ছেদের প্ররোচনা দেই।

আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্ত্রীকে শাসন করতে বলেছেন, তবে অমানবিক শারীরিক নির্যাতন করার অনুমতি দেননি। অথচ আমাদের সমাজে যৌতুকের মতো নিকৃষ্ট বিষয় নিয়েই মূলত স্ত্রীকে নির্যাতন করার ঘটনা ঘটে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। আমরা যদি যৌতুকের মতো বিধর্মী কালচারগুলো নিষিদ্ধ করতে পারতাম, তাহলে আজ আমাদের সংসারগুলো যৌতুকের কারণে বলি হতো না। আমরা ইসলাম থেকে সরে বিধর্মীদের সংস্কৃতি চর্চা করার কারণে আজ আমাদের এই অবস্থা।

এসব ছাড়াও স্বামীর অবাধ্যতা, নারীর উচ্চশিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কারণেও সমাজে ডিভোর্সের হার বেড়ে গেছে। ইসলাম কখনোই নারী নেতৃত্বে বিশ্বাসী নয়, তাই সংসার স্বামীর কর্তৃত্বে থাকবে। তবে তার মানে এই নয় যে, সে স্ত্রীকে অবজ্ঞা করবে; এটা কিন্তু ইসলামের শিক্ষা নয়।

সমাজে স্ত্রীদের অবাধ্যতার মূল কারণ হচ্ছে, সেক্যুলার উচ্চশিক্ষা এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। অর্থাৎ আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সেক্যুলারিজমকে প্রমোট করার কারণে দেশে নারীবাদের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটছে। যার ফলে উচ্চশিক্ষিত কিংবা শিক্ষিত নারীরা দ্বীন ইসলামের চাইতে সেক্যুলারিজমকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। ফলে তারা স্বামীর বশ্যতা স্বীকার না করে নিজেকে স্বামীর ঊর্ধ্বে রাখতে চায়। একইসাথে যেসব নারী চাকরি কিংবা অন্যান্য পেশায় নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পেরেছে, তারাও সংসারে সমান অধিকারের বলে স্বামীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে আর এই কারণে এসব নারীরা সংসার না করে ডিভোর্সের দিকে ঝুঁকে পড়ে ।

উপর্যুক্ত কারণ ছাড়াও চাকরিজীবী স্ত্রীরা সংসারে এবং পরিবারের ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো সময় দিতে পারে না, যার ফলে সংসারে স্বাভাবিকভাবেই ঝামেলা লেগে থাকে।

এছাড়াও কনের অমতে বিয়ে কিংবা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী পালিয়ে বিয়ে করার কারণেও সংসারে ডিভোর্স হচ্ছে। কখনোই কনের অমতে কিংবা পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া বিয়ে ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে না আর তাই এই জাতীয় বিয়েগুলো বেশিদিন টিকে না।

আমরা যদি শরীআত মেনে কনের অনুমতি সাপেক্ষে পরিবার থেকে বিয়ে দিতাম, তাহলে সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটত না। মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আমরা যদি ইসলাম মেনে নিজেদের জীবন পরিচালনা করি, তাহলে অবশ্যই আমাদের সমাজ এবং সংসারে শান্তি বজায় থাকবে।

এছাড়াও আমাদের দেশে দ্বীনদারিতার চাইতে অর্থ-সম্পদকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। যার ফলে পাত্র দ্বীনদার হলেও অর্থ-সম্পদ না থাকার কারণে কোনো অভিভাবকই তার মেয়েকে ঐ পাত্রের কাছে বিয়ে দেয় না। পরবর্তীতে যখন পয়সাওয়ালা ছেলে দেখে মেয়ের বিয়ে দেয়, তখন সেই সংসারে স্বাভাবিকভাবেই নানান কারণে অশান্তি শুরু হয়। তাই দ্বীনদার পাত্র-পাত্রী পছন্দ না করার কারণেও সংসারে ভাঙন দেখা দেয়।

ইসলাম প্রতিপালনই ডিভোর্সের সমাধান:

উপর্যুক্ত কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে ইসলামের চর্চা না থাকার কারণে আমরা বর্তমানে ডিভোর্স নামক ভয়ংকর ব্যাধির সম্মুখীন হচ্ছি। আমরা যদি আমাদের জীবনে ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতাম, তাহলে আমাদের পরিবারগুলোতে আজ এই করুণ দশা হতো না।

আমরা যদি বিয়ের আগে পাত্র বা পাত্রীপক্ষকে ইসলামের মাপকাঠিতে যাচাই করতে পারি, তাহলে আমরা ভবিষ্যৎ ডিভোর্স থেকে রেহাই পেতে পারি। একজন প্রকৃত মুমিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের চর্চা করে। তাই একজন ঈমানদার স্বামী কখনোই তার স্ত্রীর প্রতি অন্যায়-অবিচার করতে পারে না। একইসাথে একজন পরহেযগার মেয়ে সংসারে যতই দুঃখ-কষ্ট থাকুক না কেন, সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা করে। সে আপ্রাণ চেষ্টা করে শত বঞ্চনা সত্ত্বেও সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য।

অতএব, আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে নিজে দ্বীনদার হয়ে একজন দ্বীনদার সঙ্গী খোঁজা। যাতে নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মও দ্বীনদার হতে পারে। তবে এটা খুবই অনুচিত যে, নিজে ইসলাম পালন না করে একজন পরহেযগার সঙ্গীকে বিয়ে করা। বিশেষ করে আমাদের সমাজে বিয়ের সময় পরহেযগার ছালাত আদায়কারী মেয়েকে বাছাই করা হয়; অথচ ছেলে ছালাত তো দূরের কথা, ইসলামের ছোটখাটো বিষয়গুলোও ঠিকমতো মানে না। আর তাই বিশিষ্ট আলেমদের অভিমত হচ্ছে, বেনামাযীর সাথে নামাযীর বিয়ে বৈধ নয়।

সুতরাং আগে নিজে দ্বীনদার হয়ে, তারপর আরেকজন দ্বীনদার সঙ্গী নির্বাচন করতে হবে। নিজে ইসলাম পালন না করে পরহেযগার স্ত্রী চাওয়াটা এক ধরনের স্ববিরোধিতা।

এই কারণে আমাদের উচিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। তাই আসুন! আমরা আমাদের জীবনে ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করি, যাতে আমরা বিবাহবিচ্ছেদ বা ডিভোর্সের মতো মর্মান্তিক ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

আল্লাহর ভালোবাসা লাভের উপায়

*-মিজানুর রহমান**

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, কল্যাণ ও পুণ্য লাভের সংক্ষিপ্ত ও সহজতম পথ হলো আল্লাহর মাখলূক্বের প্রতি—বিশেষ করে মানুষের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে তাঁর বান্দাদেরকে অবশ্যই ভালোবাসতে হবে এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বান্দার সহযোগিতায় রত থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন'।[১]

উপরে বর্ণিত হাদীছটি দ্বারা বোঝা যায়, কেউ আল্লাহর কোনো বান্দাকে সাহায্য করলে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করেন। সুতরাং আমাদের সবার উচিত জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে প্রয়োজনে সাহায্য করা। আর আল্লাহ তাআলার বান্দাদেরকে সাহায্য-সেবা করার মাধ্যমে আল্লাহর সেবা করা হয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে যাওনি!' সে বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমি কীভাবে আপনাকে দেখতে যাব, অথচ আপনি জগৎসমূহের প্রতিপালক?' তিনি বলবেন, 'তুমি তো জেনেছিলে যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, তবুও তুমি তাকে দেখতে যাওনি! তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে, তবে আমাকে তার কাছে পেতে?' 'হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাদ্য দাওনি!' সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কীভাবে আপনাকে খাদ্য দিব, অথচ আপনি জগৎসমূহের প্রতিপালক?' তিনি বলবেন, 'তুমি তো জেনেছিলে যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাদ্য দাওনি! তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে খাদ্য দিতে, তবে আমার নিকট তা পেতে?' 'হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি দাওনি!' সে বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমি কীভাবে আপনাকে পানি পান করতে দিব, অথচ আপনি জগৎসমূহের প্রভু?' তিনি বলবেন, 'তুমি তো জেনেছিলে যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি দাওনি! তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে তবে আমার নিকট তা পেতে?''[২]

আলোচ্য হাদীছটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, বান্দাকে সেবা করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা পাওয়া যায়। এজন্য প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির করণীয় হলো মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করা, সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা, মানবকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে সর্বদা সম্পৃক্ত রাখা, মানুষের উপকার করতে না পারলে অন্তত ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব ছাদাক্বা করা'। ছাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! যদি কারও দান করার মতো কিছু না থাকে?' তিনি বললেন, 'সে নিজ হাতে উপার্জন করবে। অতঃপর সে তার মাধ্যমে নিজে উপকৃত হবে এবং অন্যকে দান করবে'। ছাহাবীগণ বলেন, 'হে আল্লার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! যদি সে তাও করতে সক্ষম না হয়? তিনি বলেন, 'তাহলে সে সাহায্যপ্রার্থী অভাবী মানুষকে সহযোগিতা করবে'। ছাহাবীগণ বলেন, 'হে আল্লার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! যদি সে তাও করতে সক্ষম না হয়? তিনি বলেন, 'তাহলে সে ভালো কাজ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। এটাও তার জন্য দান-ছাদাক্বা বলে গণ্য হবে'।[৩]

জনকল্যাণমূলক কাজে দান করার গুরুত্ব অপরিসীম। কারও নিকট দান করার মতো অর্থ-সম্পদ না থাকলে, সে প্রয়োজনে নিজ হাতে উপার্জন করে হলেও দান-ছাদাক্বা করবে। মানুষের কোনো উপকার সাধন করতে না পারলে অন্তত কারও ক্ষতি করা সমীচীন নয়। আর সাহায্য-সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে ইয়াতীম, বিধবা ও সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কারণ সমাজের এ দুর্বল শ্রেণিগুলোর সেবা ও অধিকার রক্ষার চেষ্টার জন্য রয়েছে বিশেষ ছওয়াব ও মর্যাদা। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইয়াতীমের রক্ষণাবেক্ষণ বা লালনপালন করে, সে আমার সাথে পাশাপাশি জান্নাতে থাকবে'— একথা বলে তিনি মধ্যমা ও তর্জনীকে পাশাপাশি রেখে দেখান'।[৪]

আমাদের সমাজে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইয়াতীমদেরকে শুধু ঠকানোর ফন্দিফিকির করা হয়। তাদের সম্পদ কীভাবে গ্রাস করা যায়—এমন চিন্তা অনেকের মাথায় থাকে। ইয়াতীমের লালনপালন, তাদের স্বার্থ রক্ষার কাজ করা কত ছওয়াব ও মর্যাদার কাজ, তা আমরা বুঝি না বা বুঝতে চেষ্টা করি না। অথচ ইয়াতীমের লালনপালনকারী, সাহায্য-সহযোগিতাকারী স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর সাথে জান্নাতে পাশাপাশি থাকবেন। আর বিধবা, অসহায়-দরিদ্র সমাজের এরূপ অবহেলিত

---

* প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদরাসা, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭০০; তিরমিযী, হা/১৪২৫।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/২৬৯।

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১০০৮।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬০০৫; মিশকাত, হা/৪৭৩৫।

মানুষের কল্যাণ সাধন ও স্বার্থ রক্ষার কাজ করা অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বিধবা ও দরিদ্রদের স্বার্থ সংরক্ষণ বা কল্যাণের জন্য চেষ্টারত মানুষ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত, বিরামহীন তাহাজ্জুদ আদায়কারী এবং অবিরত ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তির ন্যায়'।[৫]

যিনি বিধবা ও দরিদ্র মানুষকে সহযোগিতা করেন, তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের কাজ করেন, তিনি অকল্পনীয় ছওয়াব লাভ করেন। একজন মানুষ আল্লাহর পথে জিহাদ করে, বিরামহীন (নিয়মিত) তাহাজ্জুদ আদায় করে, অবিরত ছওম পালন করে যতটা ছওয়াব লাভ করেন, ঠিক ততটা ছওয়াব ও মর্যাদা লাভ করেন— যিনি বিধবা ও দরিদ্র মানুষের স্বার্থ রক্ষার কাজ করেন। মানবকল্যাণমুখী কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখা একটি মহৎ কাজ। যা মানুষকে বিপদাপদ ও অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মানবকল্যাণমুখী কর্ম বিপদাপদ ও অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে, গোপন দান আল্লাহর ক্রোধ নির্বাপিত করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আয়ু বৃদ্ধি করে'।[৬]

আমরা সমাজে বসবাস করি। অনেক সময় সমাজের কিছু মানুষের মধ্যে পরস্পরে বিবাদ বা অশান্তি সৃষ্টি হয়। তখন আমাদের উচিত শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পারো' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১০)*।

দুজন ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করে দেওয়াকেও হাদীছে ছাদাক্বা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'দুজন মানুষের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে ন্যায়-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা দান বলে গণ্য, কোনো মানুষকে তার বাহনে উঠতে সাহায্য করা ছাদাক্বা, কারও বাহনে তার জিনিসপত্র তুলে দেওয়া দান বলে গণ্য, সুন্দর আনন্দদায়ক কথা দান বলে গণ্য, মসজিদে গমনের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ দান বলে গণ্য এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক দ্রব্য সরিয়ে দেওয়া দান বলে গণ্য'।[৭]

টাকা-পয়সা দিয়েই শুধু মানুষের উপকার করা যায়, বিষয়টা এমন নয়। একজন হতাশাগ্রস্ত মানুষের নিকট একটুখানি সান্ত্বনার বাণী শোনানো, সুন্দর আনন্দদায়ক কথার মাধ্যমে কারও মুখে হাসি ফোটানো বা সুন্দর পরামর্শ দিয়ে কারও কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা একটা বড় উপকার। যা টাকা-পয়সার মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় না। আমাদের সকলের উচিত সাধ্যানুযায়ী মানুষের উপকার করা, বিপদের সময় পাশে বসে সান্ত্বনা দেওয়া— এগুলো মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। আর আল্লাহ তাআলার নিকট সেই সব বান্দাই সবচেয়ে প্রিয়, যারা মানুষের উপকার করে। আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি প্রিয়, যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল হলো কোনো মুসলিমের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করানো অথবা তার বিপদ-কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা অথবা তার ঋণ আদায় করে দেওয়া অথবা তার ক্ষুধা নিবারণ করা। আমার কোনো ভাইয়ের কাজে তার সাথে একটু হেঁটে যাওয়া আমার কাছে এই মসজিদে অর্থাৎ মসজিদে নববীতে এক মাস ই'তিকাফ করার চেয়েও বেশি প্রিয়। যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করবে, আল্লাহ তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। কেউ নিজের ক্রোধ কার্যকর করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা সংবরণ করবে, ক্বিয়ামতের দিন মহিমাময় আল্লাহ তার অন্তরকে নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দিবেন। যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের সাথে গিয়ে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিবে, ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে, যেদিন পুলছিরাতের উপরে সকলের পা পিছলে যাবে— আল্লাহ তার পা সুদৃঢ় রাখবেন। সিরকা বা ভিনেগার যেমন মধু নষ্ট করে দেয়, তেমনিভাবে অসৌজন্যমূলক আচরণ মানুষের নেক কর্ম বিনষ্ট করে দেয়'।[৮]

আল্লাহর বান্দার সেবা করার চেয়ে তার নিকট প্রিয়তর কর্ম আর কিছুই নেই। কেউ যদি রাস্তা হতে কষ্টদায়ক কিছু সরিয়ে দেয়, এই একটি মাত্র কাজ তার সারা জীবনের ছগীরা গুনাহগুলো মাফ হওয়ার জন্য যথেষ্ট হতে পারে, হতে পারে তার জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এক ব্যক্তি রাস্তা চলতে চলতে একটি কাঁটাওয়ালা ডাল দেখতে পায়। সে ডালটি সরিয়ে দেয়। আল্লাহ তার এ কাজ কবুল করেন এবং তাকে মাফ করে দেন'।[৯] অন্য একটি হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যদি কেউ রাস্তা থেকে একটি পাথর সরিয়ে দেয়, তবে তার আমলনামায় একটি নেকী লেখা হয়। আর যদি কারও একটি নেকীও কবুল হয়ে যায়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১০]

যারা মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ বা অমায়িক ব্যবহার করেন, মানুষ যেমন তাদেরকে ভালোবাসে, ঠিক তেমনি আল্লাহ তাআলাও তাদের ভালোবাসেন। এই সুন্দর আচরণের মাধ্যমে মানুষ কল্যাণ লাভ করে থাকে এবং এর দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি হয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যদি কেউ বিনম্রতা ও নম্র আচরণ লাভ করে, তাহলে সে দুনিয়া ও আখেরাতে পাওনা সকল কল্যাণই লাভ করল আর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং সুন্দর আচরণ বাড়িঘর ও জনপদে বরকত দেয় এবং আয়ু বৃদ্ধি করে'।[১১]

প্রবন্ধটির বাকী অংশ ২১ নং পৃষ্ঠায়

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬০০৭; মিশকাত, হা/৪৭৩৪।

৬. হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৩/১১৫।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/২৯৮৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০৯।

৮. ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত, হা/৬০২৬; ছহীহুল জামে', হা/১৭৬।

৯. ছহীহ বুখারী হা/২৪৭২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯১৪।

১০. ত্বাবারানী, হা/১৯৮; বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/১১১৭৪; ছহীহুল জামে', হা/৬২৬৫।

১১. মুসনাদে আহমাদ হা/২৫২৫৯; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২৫২৪।

হে পবিত্র ভূমি আল-আক্বছা!

-হাফীযুর রহমান*

হে আল-আক্বছা! হৃদয়ের মণিকোঠায় তুমি। হে ফিলিস্তীন! হে জেরুযালেম! হে প্রাণের স্পন্দন আক্বছা! তোমার রক্তিম আকাশ আমার বিষণ্ণতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তোমার বারুদময় জীবন, দুশ্চিন্তার ক্লান্তিভাব, ছেলেহারা মায়ের ক্রন্দনরত রক্তচক্ষুর আড়ালে বিজয়ের প্রতিচ্ছবি—যা স্বপ্ন দেখায় নতুন দিগন্তের। যালেমের শত আঘাত পাথর বানিয়ে দিয়েছে, তবু তোমার মনোবল হারায়নি। তুমি যেন সেই হিত্তীনের প্রতিচ্ছবি।

হে ফিলিস্তীন! মনে রেখো, বিজয় তোমাদেরই। এ তো সাময়িক পরীক্ষা মাত্র, আল্লাহর বিচার অবধারিত। আজ না হোক কাল, বিজয় তোমাদেরই। নতুন দিগন্তের সুলতান ছালাহউদ্দীন হয়ে ফিরে এসো, হিত্তীন তো আমাদেরই। নতুন দিগন্তের নতুন হিত্তীন, যে হিত্তীন-যুদ্ধের জয় অবধারিত—সেই মহান জেরুযালেমের অধিপতি তোমায় ভুলে যাননি, হে আক্বছা!

জানো হে আক্বছা? শায়খ আলী মিয়াঁ নদভী যখন ছালাহউদ্দীন আইয়ূবীর কবর যিয়ারতে যান, সেদিন তিনি কী বলেছিলেন? তিনি সেদিন যিরিকলির সেই কবিতার পঙক্তিমালা আবৃত্তি করলেন—

ابعثوا لنا صلاح الدين من جديد
وأقيموا حطين أخرى أو مثل حطين
أعيدوا لنا العرب التي لا تُغلب

'আমাদের মাঝে ছালাহউদ্দীনকে আবার পাঠান। নতুন করে হিত্তীন কিংবা হিত্তীনের মতো আরেকটি যুদ্ধ সংঘটিত করুন। আমাদের সেই আরব জাতিকে আবার ফিরিয়ে দিন, যারা কখনো পরাজিত হয় না'।

হে আক্বছা! তোমার সেই লাবণ্যময় যৌবনের রণাঙ্গনের সেই বীরত্বগাথা ইতিহাস কি তুমি ভুলতে বসেছ? ক্রুসেডারদের বিধ্বস্ত পরাজয়। তুমি কি ভুলে গেছ, সেই গৌরবমাখা বিজয়ের কথা—যেখানে ছিল তোমার একচ্ছত্র আধিপত্য। কোথায় তোমার সেই সুলতান নূরুদ্দীন যিনকি? কোথায় হারিয়ে গেছে ছালাহউদ্দীন আইয়ূবী? কবি নিজার কুবানি বলেছিলেন—

يا قدس، يا مدينة تفوح أنبياء
يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء
يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان
من يوقف العدوان؟
عليك، يا لؤلؤة الأديان
من يغسل الدماء عن حجارة الجدران؟
من ينقذ الإنسان؟
يا قدس، يا مدينتي
يا قدس، يا حبيبتي
غداً، غداً، سيزهر الليمون
وتفرح السنابل الخضراء والزيتون

'হে জেরুযালেম! হে নবীদের তীর্থভূমি! হে আসমানের সর্বোচ্চ নিকটবর্তী পথ! তোমার চোখে ঘুরে বেড়ায় কত শত অশ্রুবিন্দু। কে থামাবে তোমার ওপর এই আগ্রাসন? হে সকল ধর্মের কাঙ্ক্ষিত ভূমি! কে ধুয়ে দেবে দেয়ালের পাথরে জমে থাকা তোমার রক্তিম ছাপ? কে উদ্ধার করবে মানবতাকে? হে জেরুযালেম! হে আমার শহর! হে জেরুযালেম! হে আমার প্রিয়! আগামীকালই তো ফুটবে লেবুর ফুল। সবুজ শস্যের জলপাই বাগান হবে আনন্দে মাশগূল'।

হে উমারের সেই বিজয়গাথা সৈনিক! ঈমান শক্ত করে মনোবল দৃঢ় রাখো, বিজয় আসন্ন। নির্বোধ নৈতিকতার অধঃপতনে নিমজ্জিত মুসলিম সমাজ তোমায় ভুলতে বসেছে, ভুলতে বসেছে বিজয়ের সেই গৌরবময় ইতিহাস। হে আক্বছা! তোমার রব কিন্তু তোমায় ভুলেনি। সেদিন আল-আক্বছা বিজয়ের পর উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন, যা আজ আবার তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি বলেছিলেন— 'আজ আমরা সেই শহরে প্রবেশ করলাম, যেখানে আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বহু বছর আগে দু'আ করেছিলেন। আল্লাহর কসম! আমাদের পূর্বসূরিরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান রাখে এবং তাঁর রাস্তায় জীবন পরিচালনা করে, তাহলে এই ভূমিতে অবশ্যই তারা বিজয়ী হবে'।

প্রিয় আক্বছা! ঈমানের ওপর অবিচল থেকো। হাজারো কষ্টের মাঝে বিচলিত হয়ো না। মনে রেখো, 'যালেমের চক্রান্তই চূড়ান্ত চক্রান্ত নয়'। আল্লাহ তাআলা বলেন,

* অধ্যয়নরত, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো, মিশর।

﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

‘তারা ষড়যন্ত্র করেছে এবং আল্লাহও তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী’ *(আলে ইমরান, ৩/৫৪)*।

মানবতার বুলি আওড়ানো মহান সেই নেতাগুলো তোমার পাশে থাকবে না। পশ্চিমা রঙে রঙিন হয়ে যাওয়া অন্তঃসারশূন্য মুসলিমরাও তোমার পাশে থাকবে না।

মনে রেখো, মুসলিমরা কখনো সংখ্যায় বিজয়ী হয়নি। বিজয় হয়েছে ঈমানের। বিজয় হয়েছে রবের আনুগত্যের।

আল্লাহ! তুমি রণাঙ্গনে সেই বীরদের মতো বীরদর্পে যুদ্ধ করার মতো মহান নেতা আমাদেরকে দাও, যার সামনে টিকবে না কোনো ক্রুসেডার বাহিনী, টিকবে না কোনো যালেমের চক্রান্ত।

বিজয়ের সুবাতাস নিয়ে ছালাহউদ্দীন আইয়ূবীরা আবার ফিরে আসবে প্রিয় আল-আক্বছার নীড়ে। আক্বছা নিয়ে লেখা কোনো এক কবির হৃদয় নিংড়ানো কবিতা দিয়ে আজকের কথামালার ইতি টানছি—

فلسطينُ في القلبِ
قلبي في فمِ القدسِ
وهذا السّحابُ الأبيضُ
يسقطُ على الجراحِ، على الجروحِ
من أجلِ القدسِ
من أجل القدس نعيشُ كالأبطالِ
سنبقى على العهدِ مهما طالَ الزمانُ
في كلّ زاويةٍ نزرعُ الأملَ
وتظلّ القدسُ في قلوبنا بَقِيّةً

‘ফিলিস্তীন আমার হৃদয়ে। আমার হৃদয় কুদসের ঠোঁটে। আর এই সাদা মেঘগুলো, ছায়া দেয় আহত স্থানগুলোকে, সেই ক্ষতগুলোকে। কুদসের জন্য আমরা বাঁচব— বীরের মতো, আমরা থাকব চির-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রতি ক্ষণে আমরা আশা বুনব, কুদস থাকবে চিরকাল আমাদের অন্তরের দহলিজে’।

কী করে ভুলি তোমায়, হে আক্বছা! আমার এ বিষণ্ন মন তোমার বিজয়ের অপেক্ষায়।

“আল্লাহর ভালোবাসা লাভের উপায়” প্রবন্ধটির বাকী অংশ

মানুষের সাথে সুন্দর আচরণের মধ্য দিয়ে নফল ছওম ও তাহাজ্জুদ ছালাতের ছওয়াব লাভ করা যায়। শুধু তাই নয়, এটি হবে দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী আমল। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের আমলনামায় সুন্দর আচরণের চেয়ে অধিক ভারী আমল আর কিছুই হবে না। যে ব্যক্তি অশ্লীল ও কটু কথা বলে বা অশোভন আচরণ করে, তাকে আল্লাহ ঘৃণা করেন। আর যার ব্যবহার সুন্দর, সে তার ব্যবহারের কারণে নফল ছওম ও তাহাজ্জুদের ছওয়াব লাভ করে’ *(তিরমিযী, হা/২০০৩; আবূ দাঊদ, হা/৪৭৯৯)*।

সুন্দর আচরণ দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী আমল এবং এর দ্বারা নফল ছওম ও তাহাজ্জুদের ছওয়াব লাভ করা যায়। তাই তো সুন্দর আচরণ মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে। হাদীছে নববীতে এসেছে, ‘যে আমল মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে, তা হলো আল্লাহর ভয় এবং সুন্দর আচরণ। আর সবচেয়ে বেশি যা মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে, তা হলো মুখ এবং যৌনাঙ্গ’ *(তিরমিযী, হা/২০০৪; ইবনু মাজাহ, হা/৪২৪৬)*।

আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা লাভ করতে হলে মানুষের সাথে সদাচরণ করতে হবে। এ সদাচরণই হলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সহজ পথ। তাই তো যারা আল্লাহর বান্দাদের সাথে সুন্দর আচরণ করবে, তারা জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু মাক্বামে স্থান লাভ করবে। প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘নিজের মতামত সঠিক হওয়া সত্ত্বেও যে বিতর্ক পরিত্যাগ করে, আমি তার জন্য জান্নাতের পাদদেশে একটি বাড়ির নিশ্চয়তা প্রদান করছি। আর যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা পরিহার করে, হাসি-তামাশাচ্ছলেও মিথ্যা বলে না, তার জন্য আমি জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি বাড়ির নিশ্চয়তা প্রদান করছি। আর যার আচার-ব্যবহার সুন্দর, আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি বাড়ির নিশ্চয়তা প্রদান করছি’ *(আবূ দাঊদ, হা/৪৮০০; ছহীহুল জামে‘, হা/১৪৪৬)*।

সুধী পাঠক! আমরা অনেকে নফল ছালাত, নফল ছওম, যিকির, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি ইবাদতের ছওয়াব সম্পর্কে যতটুকু সচেতন, মানবসেবার ফযীলত, গুরুত্ব ও ছওয়াব সম্পর্কে আমরা মোটেও সচেতন নই। অথচ আল্লাহর বান্দাদের সেবা ও তাদের সাথে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলাকে পাওয়া যায়। আর এটি আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথও বটে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে মানবসেবামূলক কাজে নিয়োজিত থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

কেন আমরা গোলাম?

*-এহসান বিন কাশেম**

সকল প্রশংসা সেই মহাজ্ঞানী আল্লাহর জন্য, যিনি নিজ জ্ঞান দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ নামক এক সৃষ্টির উদ্ভাবন করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবী নামক এক গ্রহে প্রেরণ করেছেন। সেই সাথে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন। রবের দেওয়া নেয়ামতরাজির মধ্যে প্রধান এবং প্রথম ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান, যা চর্চার মাধ্যমে মানুষ তার নিজ স্রষ্টার পরিচয় লাভ করতে পারে। সবাই এটা স্বীকার করতে বাধ্য যে, প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত জাতিসমূহের উত্থান ও পতন ঘটেছে জ্ঞানচর্চা করা অথবা তার প্রতি অবহেলার কারণে। কোনো ব্যক্তি, গোত্র বা জাতি ততদিন পর্যন্ত বিশ্বের বুকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে, যতদিন পর্যন্ত তারা জ্ঞানচর্চায় লিপ্ত থাকবে। এরই চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা হাজার বছরের ঊর্ধ্বে শাসন করা সেই মুসলিম জাতির দিকে নজর দিলেই দেখতে পাই। যখন থেকে তারা তাদের ধর্ম বা ধর্মীয় কিতাব আল-কুরআন থেকে দূরে সরে যাওয়া শুরু করেছে, হাজার বছরের শাসন করা এক বিপ্লবী জাতি তখন স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পানির উপরে স্রোতের গতিতে ভাসমান কচুরিপানার মতো মুমূর্ষু, দুর্বল, হিংসুটে, পরনিন্দাবাজ, অথর্ব, জাহেল, বর্বর, রুগ্ন এক গোলাম বা দাসত্বপূর্ণ জাতিতে পরিণত হয়েছে। যার মূল কারণ হচ্ছে জ্ঞানচর্চা এবং ধর্মচর্চা থেকে দূরে থাকা। এই দুইয়ের অপর প্রান্তে আরো দুটি জিনিসের অভাব রয়েছে, তা হলো ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদিতা। যুলুম বা অত্যাচার একটা জাতিকে শাসকের মসনদ থেকে পালিয়ে বেড়ানো গোলামে পরিণত করে। এই বিষয়গুলোর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় যদি সংশোধন করে নিতে পারে, তাহলে পুনরায় পৃথিবীর বুকে মুসলিম জাতি শির উঁচু করে শাসকের মসনদে আল্লাহর অনুগ্রহে বসতে সক্ষম হবে। আরেকটি বিষয় অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা আর তা হলো আমানতদারিতা। বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যার আমানতদারিতা নেই, তার ঈমান নেই আর যে অঙ্গীকার পালন করে না, তার দ্বীন নেই'।[১]

প্রিয় পাঠক! আমরা কি পৃথিবীর বুকে হাজার বছরের ঊর্ধ্বে শাসক ছিলাম না? আমাদের এমন দশা কীভাবে হলো যে, গোটা মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে ফিলিস্তীনের বুকে ধারণ করে রাখা এক টুকরো গাযায় পরিণত হয়েছে? পৃথিবীর বুকে এতগুলো মুসলিম দেশ থেকে লাভ কী হলো? প্রায় ২০০ কোটি মুসলিম থাকা সত্ত্বেও গাযার মুসলিমদের উপর মধ্যপ্রাচ্যে ভিত্তিহীনভাবে জোরপূর্বক দখলদার সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী মুসলিমদের রক্তচোষা, অত্যাচারী, বর্বর, গিরগিটির মতো রং পরিবর্তনকারী নেতানিয়াহুর আদেশে বোমা নিক্ষেপ করে। সেই বোমার শব্দে গাযার কোমলমতি শিশুদের যখন ঘুম ভাঙে, তখন মনে হয় পৃথিবীতে কেবল মুসলিম হিসেবে বেঁচে আছে গাযাবাসীরা। মুসলিম জাতি যখন চিত্তবিনোদনে ব্যস্ত, গাযাবাসী তখন বিষণ্ন ও চিন্তিত। মুসলিমরা যখন উদরপূর্তি করে রাত যাপন করে, গাযাবাসী তখন ক্ষুধার্ত ও সদা জাগ্রত। মুসলিম বিশ্ব যখন খাদ্য অপচয়ে ব্যস্ত, গাযাবাসী তখন এক টুকরো রুটির জন্য এবং এক ঢোক পানির জন্য উদ্ভ্রান্ত। ধিক্কার আমাদের জন্য! আমরা মুসলিম হিসেবে লজ্জিত! জাতি হিসেবে লাঞ্ছিত!

প্রিয় পাঠক! মুসলিম জাতির এত অধঃপতন নেমে আসল কীভাবে? এই জাতি কি নেতৃত্বে ও গুণাবলিতে শ্রেষ্ঠ শাসক ছিল না? তাহলে কি এই জাতির অবস্থা মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতো হয়ে গেছে? যে মেরুদণ্ডের উপর ভর দিয়ে শির উঁচু করে রবের গযব নিপতিত হয়েছে এমন নিকৃষ্ট বর্বর ইয়াহূদী জাতির সম্মুখে দাঁড়ানো কি শুধু স্বপ্নঘোর হয়ে থাকবে? উছমানীয় খেলাফতের শত বছর গত হওয়ার পরও কি এই জাতির পুরুষ ও নারীরা উমার ইবনুল খাত্ত্বাব, খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ, ছালাহউদ্দীন আইয়ূবীর উত্তরসূরি নির্ভীক কোনো সন্তান উপহার দিতে ব্যর্থ হয়েছে? যদি ব্যর্থ না হয়ে থাকে, তাহলে এমন কোন বিশেষ কারণ আছে যার জন্য আমরা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের মুখোমুখি হয়ে শির উঁচু করে বলিষ্ঠ কণ্ঠে জবাব দিতে ব্যর্থ হচ্ছি? তাদের কাছে এমন কী আছে, যা আমাদের কাছে নেই? **অবশ্যই তাদের কাছে এমন কিছু আছে, যা বর্তমানে মুসলিম জাতির কাছে নিতান্তই স্বল্প। তা হলো গোমরাহী এবং পথভ্রষ্ট হওয়ার পরেও তারা তাদের ধর্মের ওপর অটুট পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে কাজ করে যাচ্ছে, বিশেষত ইয়াহূদীরা। অপরদিকে আমরা মুসলিমরা শতভাগ**

* শিক্ষার্থী, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

১. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৩০০৪।

সত্য ধর্মের অনুসারী হওয়ার পরেও সন্দেহের কারণে বা আত্মবিশ্বাসের অভাবে ধর্মকে খেল-তামাশার পাত্রে পরিণত করেছি। কপাল তো আমাদের পুড়বেই!

জাতির উন্নতি ও অবনতির পেছনে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি, এক বাক্যে জাতির মেরুদণ্ড যারা, তারাই হচ্ছে যুবক। দেড় হাজার বছর পূর্বে আরবের বুকে যখন বিপ্লবের প্রভাত প্রস্ফুটিত হয়েছিল, সেকাল থেকে ফিলিস্তীনীদের সাথে মুসলিম সংস্কৃতি পরিবর্তনকারী, বিশ্বাসঘাতক ব্রিটিশ বেনিয়াদের উত্থানের পূর্বে হাজার বছরের ঊর্ধ্বে পৃথিবী শাসনকারী মুসলিম জাতির মধ্যে অধিকাংশ অবদান ছিল যুবকদের। যুবকদের প্রধান শক্তি হচ্ছে ধর্মীয় জ্ঞানচর্চা, যা মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ধর্মীয় জ্ঞানচর্চায় ব্যস্ত যুবক নিতান্তই কম। এ জাতির অধঃপতন ঠেকাবে কী দিয়ে? বর্তমান বিশ্বের দিকে নজর দিলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রযুক্তি এবং জ্ঞানচর্চায় উন্নতির শিখরে অবস্থান করছে এমন এক জাতি, যারা নিকট অতীতেও জানত না প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতি শব্দদ্বয় বলতে কী বুঝায়। ইতিহাসের পাণ্ডুলিপিতে স্পষ্ট লিখিত আছে, জ্ঞানচর্চা এবং সংস্কৃতির পাঠদানকারী মুসলিমদের গৌরবময় শহর বাগদাদ যখন আধুনিকতা ও প্রযুক্তির আলোতে আলোকিত, তখন বর্তমান প্রযুক্তির পাঠদানকারী, মুসলিম জাতির অবদান অস্বীকারকারী, প্রযুক্তির আবিষ্কার আত্মসাৎকারী এবং পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ইউরোপের লোকেরা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য রবের তৈরি নিখুঁত খুঁটিহীন আকাশের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করত। সেই মূর্খ ও বর্বর জাতি থেকে তারা কীভাবে শাসকে পরিণত হলো আর মুসলিম জাতি শাসক থেকে গোলামে কীভাবে পরিণত হলো?

প্রিয় পাঠক! এর মূল কারণ হচ্ছে আজ মুসলিম যুবকরা রবের দেওয়া মহান অনুগ্রহ জ্ঞানচর্চার পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে দাসত্বের প্রধান সরঞ্জাম, সময় অপচয়ের কারখানা, যুব সমাজের প্রোডাক্টিভিটি ধ্বংসের প্রধান হাতিয়ার সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নামক বিষক্রিয়ায় জর্জরিত। যার অতিরঞ্জিত ব্যবহারের মাধ্যমে মুসলিম যুবারা নিজের সৃজনশীলতা হারিয়ে ভিন্ন জাতির অনুসরণ এবং অনুকরণে নিজেদেরকে সঁপে দিচ্ছে। এটাই যদি বর্তমান মুসলিম জাতির যুবকদের অবস্থা হয়, তাহলে কীভাবে সে জাতি গোলাম থেকে শাসকের মসনদে গৌরবমণ্ডিত অতীতের ন্যায় বসতে সক্ষম হবে?

প্রিয় পাঠক! বর্তমান বিশ্বে যারা নিজেদেরকে সুপার পাওয়ার বলে দাবি করে, তাদের দিকে দৃষ্টি দিলেই আমরা দেখতে পাব যে, নিষ্ফল বিনোদন আর উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যের দিকে না হেঁটে অবিরাম চেষ্টা আর নির্ঘুম রাত যাপনের মাধ্যমে মহাজ্ঞানী আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত সময়কে যতটুকু সম্ভব কাজে লাগানোর মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনে তারা ব্যস্ত। বিশেষত আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত ইয়াহূদী জাতি আর তারা গোটা বিশ্বের মুসলিম জাতিকে এটাই প্রচার করে যে, তোমরা বিনোদন, আড্ডা, মদ, জুয়া, দলে দলে বিভক্তি, ছোঁয়াচে রোগ হিসেবে খ্যাত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অযথা সময় নষ্ট করার মাধ্যমে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখো। এটাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। এটা যদি আরও স্পষ্ট করে বলতে যায়, তাহলে একটা উদাহরণের মাধ্যমে ইতি টানতে সক্ষম হব আর তা হলো ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের কাছে আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদের খনি মুসলিমদের চেয়ে নিতান্তই কম। তাহলে প্রশ্ন হলো, তারা শাসক হলো কীভাবে? এর স্পষ্ট সমাধান হলো তাদের কাছে আছে অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, হার্ভার্ড, এমআইটির মতো বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাপীঠ, যা বর্তমান মাকাল ফল সদৃশ জ্ঞানচর্চাহীন মুসলিম যুবকদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করে তারা তৈরি করেছিল। আর মুসলিম জাতির হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিনোদনের পণ্যসমগ্র। যার চাক্ষুষ প্রমাণ হিসেবে আমরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত আকল (জ্ঞান) নামক বস্তুর কাছে প্রশ্ন ছুড়ে দিলে স্পষ্ট উত্তর পেয়ে যাব।

প্রিয় পাঠক! পরিশেষে এটাই ব্যক্ত করতে চাই, মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ পথে চলার মাধ্যম, হেদায়াতের পথনির্দেশক আল-কুরআন এবং তার ঐ পথে আহ্বানকারী রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ ও নিষেধ মান্য করে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তকে জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত রাখলে হয়তো একবিংশ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে শির উঁচু করে ফিলিস্তীনের বুকে অবস্থিত রক্তে রঞ্জিত এক টুকরো গাযাবাসীর ক্বিছাছ আদায়ে সক্ষমতা অর্জন করতে পারব, ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন!

ফিলিস্তীন ইস্যুতে মুসলিম উম্মাহর শিক্ষা!

*-ইবনু মাসঊদ**

ফিলিস্তীন ইস্যুতে ইতিহাস এবং করণীয় নিয়ে গুণীজনরা নানা কথা বললেও এই ইস্যুর মাঝে অনেক বাস্তব শিক্ষা আছে, সেটা নিয়েও লেখা দরকার। ফিলিস্তীনে বর্তমান কী হচ্ছে, সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে আমাদের অজানা নয়। তাই এই প্রবন্ধ থেকে ফিলিস্তীন ইস্যুতে আমাদের শিক্ষা কী? সে বিষয়ে ক্ষুদ্র আলাপ হবে ইনশা-আল্লাহ।

৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে নতুন করে ইসরাঈলী হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। এসব হামলায় ৫০ হাজারের বেশি মুসলিম নিহত হয়েছে। এসব হামলায় আহতের সংখ্যা— ১ লক্ষ ১৩ হাজারের বেশি। ফিলিস্তীনের ৯০ ভাগ জনসংখ্যা বাস্তুচ্যুত হয়েছে।[১]

ফিলিস্তীন ইস্যুতে আমাদের শিক্ষা কী?

দেখুন পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনা ও কাজে শিক্ষা আছে। ঠিক তেমনি ফিলিস্তীন থেকে আমাদের অনেক শিক্ষা রয়েছে। তাই নিচে সে বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

(১) ঐক্যের বিকল্প নেই: মুসলিমদের মাঝে সকল দল-উপদল এই একটা আয়াত দিয়ে মানুষকে একতার দিকে ডাক দেয়। এমন কোনো মুসলিম দল, ব্যক্তি, পাওয়া যাবে না, যে এই আয়াতের কথা উল্লেখ করে না। সেই আয়াতটি হলো, ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ ‘তোমরা সকলে একসঙ্গে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না’ *(আলে ইমরান, ৩/১০৩)*।

সকল দল-উপদল এই আয়াতের কথা বললেও আজ সকল দল-উপদল এক হতে পারেনি। যা মুসলিম বিশ্বের জন্য ক্ষতি ছাড়া কিছুই বয়ে আনছে না। তাই আমাদের উচিত কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী মুসলিম বিশ্বের স্বার্থে সকলে এক থাকা। আমাদের উচিত, এই মুসলিম বিশ্বকে কীভাবে এক করা যায়—তা নিয়ে চিন্তা করা। বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলো উম্মাহর স্বার্থকে ভুলে নিজের জাতীয়তাবাদ কিংবা গণতন্ত্র পূজারি হওয়ার ফলে মুসলিম বিশ্বের এই অবস্থা। আমাদের মুসলিম দেশগুলো আজ কেবল নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছে। ভুলে গেছে ফিলিস্তীন শব্দটির কথা। তাই আমাদের উচিত হবে, মুসলিম বিশ্বের মাঝে ঐক্য ফিরিয়ে আনা।

(২) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা: গণতন্ত্রের দাস হয়ে বর্তমান মুসলিম বিশ্ব পশ্চিমাদের অলিখিত দাস হয়ে আছে। গণতন্ত্রের মুখে লাথি মেরে যতদিন না এই বিশ্বে ইসলামী আইন ক্বায়েম হবে, ততদিন এই বিশ্বে মুসলিমদের উপর নির্যাতন হবেই। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি যে জাতির উপর নির্যাতন করা হচ্ছে, সেটা মুসলিম জাতি। তাই আমাদের উচিত হবে, সকলে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। আজ যদি গণতন্ত্রের দাস না হয়ে বিশ্বে ইসলামী শরীআহ থাকত, তাহলে এই অত্যাচার কি কখনো হতো?

(৩) আত্মরক্ষায় অগ্রগামী হওয়া: এক্ষেত্রে প্রথমে একটা হাদীছ উল্লেখ করি। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের তুলনায় আল্লাহর কাছে অধিক উত্তম ও প্রিয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে’।[২]

উক্ত হাদীছে শক্তিশালী বলতে কি শুধু ঈমান ও আমলকে বুঝানো হয়েছে? বিষয়টি এমন নয়। এখানে মানসিক ও শারীরিক শক্তিও উদ্দেশ্য। পাকিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মাদরাসায় কুংফু, সাঁতার, তিরন্দাজ, ঘোড়া চালনা শিখানো হচ্ছে। সাথে সাথে মুসলিম নারীদেরকেও আত্মরক্ষার স্বার্থে কুংফু শিখানো হচ্ছে। আমাদের সমাজ মনে করছে, এই ধরনের খেলা খেললেই জঙ্গি। বিষয়টি এমন হওয়ার অপরাধ আমার আপনার। আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলি না।

নিজের অধিকার, নিজেকে রক্ষা করা কি জঙ্গিবাদ হতে পারে? তাই আমাদের উচিত এখন থেকে আত্মরক্ষার কৌশল রপ্ত করা।

(৪) নিজস্ব মিডিয়া তৈরি করা: খুব ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বলতে হচ্ছে, মুসলিম বিশ্বে আমাদের মিডিয়া নেই। আপনি জানলে অবাক হবেন, বর্তমান গাযায় পানি শূন্যতায় ভুগছে মুসলিমরা। বিভিন্ন মিডিয়াতে বলা হলেও ইসরাঈল ত্রাণ

---

* অর্গানাইজার, রেনেসাঁ লিটারেচার অ্যান্ড কালচারাল ডিপার্টমেন্ট, রেনেসাঁ ফাউন্ডেশন।

১.https://apnews.com/article/israel-palestinians-hamas-war-lebanon-hezbollah-iran-news-11-20-2024-5da3ce43df8662fe9eeab4ad804bdc0f

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৪।

প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে। বাস্তবতা হলো অনুমতি দিচ্ছে। তবে, পর্যাপ্ত ত্রাণ অনুমতি দিচ্ছে না। এখনও গাযায় প্রতি ১ সপ্তাহে শুধু এক দিন পানির ট্যাংক আসে। সেই পানি সকলের জন্য পর্যাপ্ত নয়। যার ফলে গাযার মুসলিম ভাইরা লবণাক্ত পানি খাচ্ছে। গাযাতে এই অবস্থা কেন পানি নিয়ে? কারণ গাযায় বিদ্যুৎ বন্ধ করে রেখেছে ইসরাঈল। আমি এই তথ্যগুলো ফিলিস্তীনি গণমাধ্যম থেকে ব্যক্তিগতভাবে জানি গত ২ মাস ধরে। কিন্তু বিশ্ব মিডিয়া গাযার লবণাক্ত পানি ইস্যুতে ঘুমিয়ে আছে। আসলে ফিলিস্তীনে কী হচ্ছে? সেটা জানতে দিচ্ছে না ইয়াহূদীরা।

গাযার সরকারি মিডিয়া অফিসের মতে, এ পর্যন্ত ২১১ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে, ওয়াটসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের ‘কস্টস অফ ওয়ার’ প্রকল্পের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, গাযায় সংঘর্ষে ২৩২ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন, যা এটিকে সাংবাদিকদের জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাণঘাতী সংঘর্ষে পরিণত করেছে। এছাড়া, কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) জানায় যে, ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী নিহত ১২৪ জন সাংবাদিকের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই ফিলিস্তীনি, যারা ইসরাঈল-গাযা সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন।[৩]

তাই আমাদের উচিত, মুসলিম বিশ্বের জন্য সত্য প্রচারে মিডিয়া তৈরি করা। বর্তমানে কিছু মিডিয়া মুসলিমদের দখলে থাকলেও তা মোটেও যথেষ্ট নয়।

(৫) মুসলিম সেনাবাহিনী তৈরি করা: সঊদী আরব ২০১৫ সালে সারা বিশ্বের মুসলিম দেশগুলো নিয়ে মুসলিম সেনাবাহিনী করতে চাইলেও পরে সাড়া না পাওয়ায় তা হয়ে উঠেনি! অবশ্য নামকা ওয়াস্তে একটি সংগঠন করা হয় ২০১৫ সালে। সে সংগঠনটির নাম- Islamic Military Counter Terrorism Coalition (আরবী: التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب)। বর্তমানে এই সংগঠনটির সদস্য ৪১টি মুসলিম দেশ।[৪]

আজ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের ৪১টি দেশ নিয়ে গঠিত এই সংগঠনটি ফিলিস্তীন ইস্যুতে পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো বিবৃতি দেয়নি। সামরিক সাহায্য তো দূরের কথা সামান্য দুঃখ প্রকাশও করেনি।

মুসলিম বিশ্বের শাসকরা যেন এই গণহত্যার এক ক্ষমতাধর দর্শক! ৫৭টি মুসলিম দেশের শাসকরা যেন হাতে চুড়ি পরে বসে আছে। আজ যদি আমাদের একটি সম্মিলিত সেনাবাহিনী থাকত, তাহলে কি ইসরাঈলের মতো দেশ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারত? তাই ফিলিস্তীন ইস্যুতে আমাদের বড় একটি শিক্ষা হলো, মুসলিম সেনাবাহিনীর অভাব।

ফিলিস্তীন ইস্যুর মাঝে শিক্ষা ও ইতিহাসের অভাব নেই, যা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিশদ আকারে আলোচনা অসম্ভব। তাই পাঠকদের প্রতি আহ্বান— আপনার অবস্থান থেকে মুসলিম ভাইদের জন্য কিছু করুন। সাধ্য অনুযায়ী ফিলিস্তীনি ভাইদের জন্য দান করুন। আর মহান রবকে বলুন, ‘হে রব! তুমি ফিলিস্তীনকে মুক্ত করো’- আমীন!

---

৩. https://cpj.org/2025/03/cpj-denounces-israels-killing-of-2-more-gaza-journalists-in-return-to-war/

https://www.aljazeera.com/news/2025/4/2/gaza-war-deadliest-ever-for-journalists-says-report?utm_source=chatgpt.com

https://en.mehrnews.com/news/230322/Israel-s-war-on-Gaza-killed-211-journalists-Media-Office?utm_source=chatgpt.com

8. https://www.reuters.com/article/world/saudi-arabia announces-34-state-islamic-military-alliance-against-terrorism-idUSKBN0TX2PG/?utm_source=chatgpt.com

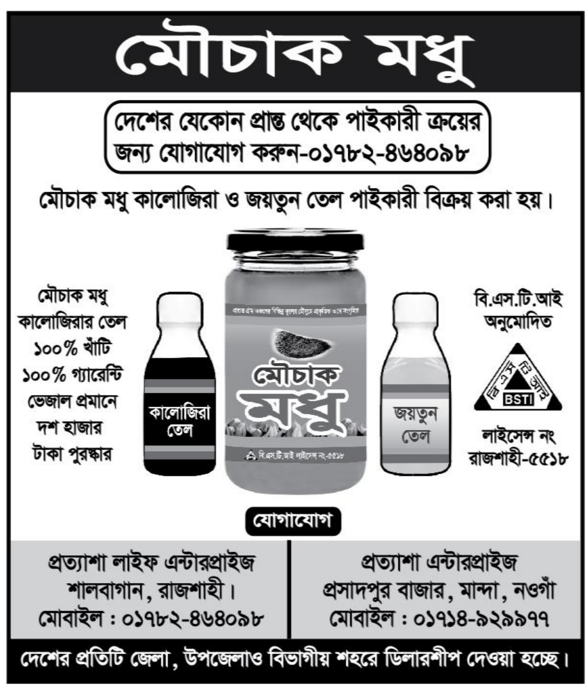

হে বিপদগ্রস্ত! ধৈর্য ধরো এবং ছওয়াবের প্রত্যাশা রাখো

*[৮ শা'বান, ১৪৪৬ হি. মোতাবেক ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ড. ছালাহ বিন মুহাম্মাদ আল-বুদাইর** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক **আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করে যথাযথভাবে তা নির্ধারণ করেছেন এবং যিনি বালা-মুছীবত ও পরীক্ষাকে সতর্কীকরণ, আল্লাহর স্মরণ, গুনাহ মোচন ও পরিশুদ্ধতা অর্জনের মাধ্যম করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী ও নেতা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, যিনি তাঁর রবের পক্ষ থেকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং আল্লাহর আদেশে তাঁর পথে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরিত হয়েছেন। অতএব, মহান আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর পরিবার, তাঁর উজ্জ্বল মুখাবয়ব এবং বিশুদ্ধ যবান ও মহৎ হৃদয়ের অধিকারী ছাহাবীদের ওপর অগণিত দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন।

অতঃপর, হে মুসলিমগণ! আপনারা আল্লাহভীতি অবলম্বন করুন, কেননা আল্লাহভীতি দ্বারা হৃদয় সকল অপবিত্রতা ও খারাপ বিষয় থেকে পবিত্র হয় এবং অন্তর সকল মন্দ ও ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০২)*।

হে মুসলিমগণ! এই দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের অভয়ারণ্য, যেখানে বিপর্যয় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এখানে দুঃখ-বেদনা বারবার ফিরে আসে। এর যন্ত্রণার কাছে প্রশস্ত আকাশও সংকীর্ণ মনে হয়, এ যেন হৃদয়কে দগ্ধ করে এবং এর বেদনা মন ও শরীরকে ভেঙে ফেলে। আমরা প্রতিদিন দেখছি একজন প্রস্থানকারীকে বিদায় জানাতে, একজন শারীরিকভাবে দুর্বল ও ভেঙে পড়া মানুষকে তার কাছের আত্মীয়কে হারাতে এবং প্রিয়জনের বিচ্ছেদে ব্যথিত হতে। বস্তুত যে ব্যক্তি দুনিয়াতে চিন্তামুক্ত জীবন প্রত্যাশা করে, সে আসলে অসম্ভব কিছু প্রত্যাশা করে। প্রকৃতপক্ষে সময় কখনোই দুঃখের ছোবল বা ভয়ের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধনসম্পদ আর তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে' *(আলে ইমরান, ৩/১৮৬)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি প্রকাশ করে দেই তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কথা-কাজ পরীক্ষা করে নেব' *(মুহাম্মাদ, ৪৭/৩১)*।

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর সিদ্ধান্ত এবং তাক্বদীরের ওপর ঈমান রাখে, তার জন্য বালা-মুছীবত থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়ে যায়। পৃথিবীতে কিছুই আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে ঘটে না। সকল নির্দেশ পূর্বনির্ধারিত এবং আল্লাহর পরিকল্পনা মাফিক ঘটে।

এমনকি চলার পথে কেউ সামান্য কাঁটার আঘাত বা রক্তক্ষরণ বা ক্ষুদ্র আঘাত পেলেও তা সবই আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য ও পূর্বনির্ধারিত ফয়সালার অংশ। মহান আল্লাহ বলেন, 'যমীনে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে এমন কোনো মুছীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। যাতে তোমরা আফসোস না করো তার উপর, যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও, তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোনো উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না *(আল-হাদীদ, ৫৭/২২-২৩)*।

হে মুসলিমগণ! আপনারা যুগের দুর্বিপাককে খুব গুরুতর মনে করবেন না, কঠিন বিপদেও ভেঙে পড়বেন না। সংকটকালকে দীর্ঘ মনে করবেন না এবং ঘোর বিপদেও হতাশ হবেন না। মনে রাখবেন! যত কঠিন বিপদই আসুক না কেন, তা চিরস্থায়ী নয়। নিশ্চয়ই কষ্টের পর স্বস্তি আসে, পরাজয়ের পর আসে বিজয় আর অস্থিরতার পর আসে শান্তি, যেভাবে বৃষ্টির পর দেখা দেয় নির্মল স্বচ্ছ আকাশ। চূড়ান্ত সংকটের পরেই আল্লাহর রহমত নেমে আসে। যখন বিপদ চরমে পৌঁছে, তখনই নেমে আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি। তাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না, বিষণ্ণতাকে সঙ্গী করবেন না, হতাশায় বন্দি হবেন না, দুশ্চিন্তার গোলামীতে নিজেকে আবদ্ধ করবেন না। কারণ দুশ্চিন্তার বিষক্রিয়া চিন্তাভাবনাকে বিভ্রান্ত করে ও জীবনকে সংকুচিত করে ফেলে।

কাজেই অতীতের হারিয়ে যাওয়া কিছু নিয়ে অতিরিক্ত অনুশোচনা করে নিজেকে অতিমাত্রায় বিষাদ, আফসোস ও দুঃখের মধ্যে ফেলবেন না। বিপর্যয় ও যন্ত্রণার স্মৃতি স্মরণে অতিরঞ্জন করবেন না। কারণ অতিরিক্ত দুঃখ মনের শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়, হৃদয়কে ভেঙে চুরমার করে দেয় আর দেহকে নিঃশেষ করে ফেলে।

কতক ব্যক্তি তো এমন আছে যে, তারা সন্তান বা পিতা-মাতাকে হারানোর কারণে বিষাদে এমনভাবে কান্না করতে থাকে, যা তার শক্তি ফুরিয়ে যাওয়া ও অস্তিত্ব বিলীন না হওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকে। অতএব, আপনার মনকে সেই সমস্ত বিষয়ে ব্যস্ত করবেন না, যা আপনার থেকে চলে গেছে বা দূরে সরে গেছে। আপনার ভাগ্যে যা লেখা ছিল না এমন কোনো অতীতের দুঃখ, আক্ষেপ ও অনুশোচনায় নিজের জীবনকে ধ্বংস করবেন না।

হে আহত ও বিমর্ষ হৃদয়! প্রত্যেক বিপদ ও সমস্যায় 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন' পাঠ করুন। কারণ এটি দুঃখ ও উদ্বেগের উপশমকারী এবং শোকাহতদের জন্য সান্ত্বনার বাণী। মহান আল্লাহ এই 'ইন্নালিল্লাহ...'-কে বিপদগ্রস্তদের জন্য আশ্রয়স্থল এবং পরীক্ষায় নিপতিত ব্যক্তিদের জন্য একটি প্রতিরক্ষা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যারা ধৈর্যধারণ করে এবং তা পাঠ করে, তাদের ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে মহান আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় ক্ষমা ও রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে। যারা তাদের উপর বিপদ আসলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও রহমত এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৫-১৫৭)*।

উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'কোনো মুসলিমের ওপর যখন কোনো বিপদ আসে এবং সে আল্লাহর নির্দেশ মেনে বলে, আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমাকে এ মুছীবতের বিনিময় দান করুন এবং এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করুন। তাহলে আল্লাহ তাকে তার মুছীবতের বিনিময় দান করবেন এবং তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করবেন'।[১]

হে বিষাদগ্রস্ত ও ব্যথিত হৃদয়! ধৈর্য হলো মুমিনের জন্য ঢাল এবং আল্লাহর উপর ভরসাকারীর জন্য দুর্গস্বরূপ। তাই ধৈর্য ধরুন এমন বিপদের ওপর, যা আপনাকে দুর্বল করে দিয়েছে এবং যার কঠিন পরীক্ষা আপনাকে অবসাদগ্রস্ত করেছে। ভাগ্যের মিষ্টতা ও তিক্ততা উভয়ই সহ্য করতে শিখুন এবং কঠিন ও তীব্রতর পরীক্ষাকে ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করুন। কোনো মানুষেরই সারাজীবন শান্তিতে কাটেনি আর কোনো জীবিত ব্যক্তির জন্যও সুখ চিরস্থায়ী হয়নি। যে ব্যক্তি নিজের মনকে ধৈর্যের জন্য প্রস্তুত করে, সে কষ্টের তীব্রতা অনুভব করে না। যে ব্যক্তি তিক্ত কষ্ট সহ্য করে, বিপদ-মুছীবতের বোঝা বহন করে এবং আল্লাহর অবধারিত কঠিন পরীক্ষাগুলোতে ধৈর্যধারণ করে, তাকে এর বিনিময়ে অবিরাম ছওয়াব দেওয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই' *(আয-যুমার, ৩৯/১০)*।

হে আল্লাহর বান্দা! সুদৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে আপনার দুশ্চিন্তার ভাবনাগুলো ঝেড়ে ফেলুন। কারণ দৃঢ় বিশ্বাস আশাকে প্রশস্ত করে, অন্তরকে প্রশান্ত করে আর অন্তরকে স্বস্তি দেয়। আপনার ওপর আপতিত বিপদ ও ঘটমান বিপর্যয়গুলো সহজভাবে গ্রহণ করুন। কারণ আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা, তাঁকে ডাকা, তাঁর শরণাপন্ন হওয়া এবং অধিক পরিমাণে তাঁর যিকির করা জমে থাকা দুঃখ, প্রবল উদ্বেগ, অস্থিরতা সৃষ্টিকারী ভয়, গভীর বিষণ্নতা ও জ্বলন্ত অনুশোচনা দূর করে দেয়। আমরা কেবল আল্লাহর কাছেই আশা রাখি, তাঁর দয়ার মাধ্যমেই মুক্তি চাই। কতই না বড় বিপদ তাঁর অপার দয়ায় দূরীভূত হয়েছে! কত তীব্র সংকট আল্লাহর রহমতে প্রশান্তিতে পরিণত হয়েছে! কত দুঃখ তাঁর অনুগ্রহ ও করুণায় লাঘব হয়েছে! কত কঠিন দুঃখ-বেদনা তিনি তাঁর অশেষ দয়া ও কল্যাণে মুছে দিয়েছেন! কাজেই আপনি সকল কাজে পরম দয়ালু আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন, তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখুন এবং তাঁর ফয়সালার ওপর ধৈর্যধারণ করুন।

হে মুসলিমগণ! মনের দুঃখ লাঘব করা, হৃদয়কে আনন্দ দেওয়া, কষ্ট থেকে মুক্তি খোঁজা, আহত অন্তরকে শক্তিশালী করা, মন্দ চিন্তা ও উদ্বেগ মোকাবিলা করা একটি শারঈ ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাবি। কারণ লুকানো দুঃখ-যন্ত্রণা হৃদয়কে দুর্বল করে দেয়, ইচ্ছাশক্তিকে হ্রাস করে, ক্লান্তি সৃষ্টি করে, জীবনকে বিপর্যস্ত করে, কল্যাণের পথ রুদ্ধ করে দেয় এবং সঠিক পথ অনুসরণের জন্য চলতে থাকা ব্যক্তিদের গতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

কুরআন তেলাওয়াত অন্তরকে শান্তি দেয়, বিপদাপদ থেকে মুক্তির পথ তৈরি করে এবং এর মাধ্যমে দুর্দিনের যন্ত্রণা কমে যায়। সৎ ও কল্যাণকামী বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করা শরীরের জন্য স্বাস্থ্যকর এবং মনোবেদনা থেকে মুক্তির অন্যতম মাধ্যম।

দুঃখের উত্তাপ এবং কষ্টকে হালকা করার অন্যতম মাধ্যম হলো, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি জানবে যে, তার যা কিছু ক্ষতি হয়েছে বা তার উপর যে বিপদ এসেছে, তার চেয়ে বড় ও কঠিন বিপদ থেকে সে রক্ষা পেয়েছে। তাকে এটাও জানতে হবে

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৯১৮।

যে, নবী-রাসূল ও সৎকর্মশীল বান্দারাও জীবনে কোনো না কোনো সময়ে বিপদাপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন।

পরিপূর্ণ সান্ত্বনা লাভের উপায় হলো, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, যেসব যন্ত্রণা, রোগ ও বিপদ তাকে আক্রমণ করছে, তা তার গুনাহকে মোচন করে দেয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ঈমানদার ব্যক্তি এমন কোনো ব্যথা-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, দুঃখ ভোগ করে, এমনকি দুর্ভাবনা পর্যন্ত; যার বিনিময়ে তার কোনো গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[২] ফযল বিন সাহল বলেছেন, রোগ-ব্যাধির মধ্যে এমন কিছু কল্যাণ নিহিত রয়েছে, যা বুদ্ধিমান মানুষের অজানা থাকা উচিত নয়। এগুলো হলো পাপ মাফ হওয়া, ধৈর্যের পুরস্কার লাভের সুযোগ, গাফলতি থেকে জাগরণ, সুস্থতার সময় আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ, তওবায় উদ্যোগী হওয়া এবং দান-ছাদাক্বায় উৎসাহিত হওয়া।

অতএব, যে ব্যক্তি নিজের মন ও জিহ্বাকে অসন্তোষ ও বিমুখতা থেকে সংযত রাখে, তাকে তার চোখের অশ্রু, হৃদয়ের চিন্তা এবং বুকের ব্যথার জন্য পাকড়াও করা হবে না। বরং নিন্দা, দোষ ও পাপ হলো সেই ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি বুক চাপড়ায়, আর্তনাদ করে শোক প্রকাশ করে, অসন্তুষ্ট হয় এবং সত্য থেকে বিমুখ থাকে। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যারা (মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশে) গণ্ডে চপেটাঘাত করে, জামার বক্ষ বিচ্ছিন্ন করে এবং জাহেলী যুগের মতো চিৎকার করে; তারা আমাদের দলভুক্ত নয়'।[৩]

আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে ক্ষমা ও সুস্থতা দান করেছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা কিছু পেলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, বিপদে পড়লে ধৈর্যধারণ করে এবং পাপ করলে তওবা করে।

أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين.

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর অপার দয়ায় আশ্রয় প্রত্যাশীকে আশ্রয় দেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে তাদের আরোগ্য দান করেন, যারা অসুস্থতার কারণে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী ও সর্দার মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। যে তাকে অনুসরণ করে, সে হেদায়াতের পথে থাকে আর যে তাঁর অবাধ্য হয়, সে গোমরাহী ও ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হয়। আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর উপর, তাঁর পরিবার ও ছাহাবীদের উপর।

হে মুসলিমগণ! বিপদগ্রস্তদের সান্ত্বনা দেওয়া, তাদের নিকট শোকপ্রকাশ করা এবং তাদেরকে সমবেদনা জানানো মহৎ ও উত্তম কাজ। অতএব, আপনি সকল শোকাহতকে সান্ত্বনা দিন, আহত হৃদয়গুলোতে শক্তির সঞ্চার করুন, দুঃখী ও মর্মাহতদের প্রতি সহানুভূতি দেখান, তাদের উৎসাহিত করুন, ধৈর্যধারণ করতে বলুন, তাদের মনোবল বৃদ্ধি করুন এবং তাদের সহায়তা করুন।

উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কোনো এক কন্যার পক্ষ থেকে একজন সংবাদবাহক এসে তাঁকে জানাল যে, তাঁর কন্যার পুত্রের মৃত্যুযন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সংবাদবাহককে বলে দিলেন, 'তুমি ফিরে যাও এবং তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ যা নিয়ে নিয়েছেন এবং তিনি যা দিয়ে রেখেছেন সবকিছুরই তিনি মালিক। তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের মেয়াদ সুনির্ধারিত। সুতরাং তাকে গিয়ে ছবর করতে এবং প্রতিদানের আশা রাখতে বলো'। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা পুনরায় সংবাদবাহককে পাঠালেন। সে এসে বলল, আপনাকে তার কাছে যাওয়ার জন্য তিনি কসম দিয়ে বলেছেন। এরপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যাওয়ার জন্য দাঁড়ালেন, তাঁর সঙ্গে সা'দ ইবনু উবাদা ও মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-ও দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর শিশুটিকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে দেওয়া হলো। তখন শিশুটির শ্বাস এমনভাবে ক্ষীণ হয়ে আসছিল, যেন তা একটি মশকে রয়েছে। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চোখ সিক্ত হয়ে গেল। সা'দ ইবনু উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (এটা কী?) তিনি বললেন, 'এটিই রহমত বা দয়া-মায়া, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে তিনি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা দয়ালু আল্লাহ তাদের প্রতিই দয়া প্রদর্শন করে থাকেন'।[৪]

হে আল্লাহ! আমাদের ফিলিস্তীনী ভাইবোনদেরকে দখলদার যালেমদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করুন এবং মাসজিদুল আক্বছাকে দখলদার অভিশপ্ত ইয়াহূদীদের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করুন- আমীন!

---

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৭২।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/১২৯৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৩।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৭৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৯২৩।

রক্তাক্ত গাযা: পরিকল্পিত গণহত্যার মুখে এক ভূখণ্ড, এক জাতি

-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ*

অবরুদ্ধ গাযা উপত্যকায় ইসরাঈলের নৃশংস হামলায় আবারও রক্ত ঝরল। একদিনেই প্রাণ হারিয়েছেন আরও অর্ধশতাধিক ফিলিস্তিনী। গত ১৮ মাস ধরে চলা এ আগ্রাসনে শহীদের সংখ্যা ৫০ হাজার ৭০০ ছাড়িয়েছে। শুধু গত ২০ দিনেই ইসরাঈল হত্যা করেছে ৫০০'র বেশি শিশু, আর শহীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৩৫০ জনে। ৭ এপ্রিল (সোমবার) আল জাজিরার খবরে বলা হয়, দেইর আল-বালাহের পাঁচটি এলাকার বাসিন্দাদের এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দেওয়ার পর ইসরাঈল গাযার মধ্যাঞ্চলে নতুন করে বোমাবর্ষণ করে। এতে নিহত হন আরও অনেক নিরীহ মানুষ, যাদের মধ্যে একজন সাংবাদিকও রয়েছেন। এর আগের দিন, ৬ এপ্রিল, ৫০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনী নিহত হন আরেক দফা ইসরাঈলি হামলায়।

এর আগেই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC) গাযায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। গাযায় চলমান হত্যাযজ্ঞকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলাও চলছে।

গাযা: এক প্রাচীন শহর, আজ মৃত্যুপুরী

গাযা (আরবীতে: غَزَّة) ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ১৪০ বর্গমাইল আয়তনের একটি ছোট উপত্যকা। দক্ষিণ-পশ্চিমে মিসর এবং পূর্ব ও উত্তরে ইসরাঈলের ঘেরাটোপে আবদ্ধ এই ভূখণ্ডটি একদিকে যেমন ইতিহাসে সুপ্রাচীন, অন্যদিকে আজ এটি বিশ্বের সবচেয়ে বিপন্ন এলাকা।

গাযার আয়তন ঢাকার সমান হলেও, জনসংখ্যা প্রায় ২৩ লাখ—জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৬,৫০৭ জন। এখানকার ৯৯% মানুষ সুন্নী মুসলিম এবং প্রায় সবাই ফিলিস্তিনী আরব। এই ছোট ভূখণ্ডটি যেন মানবতার লাশঘরে পরিণত হয়েছে।

গাযার ইতিহাস প্রায় ৪,০০০ বছরের পুরোনো। এটি একসময় ছিল মিসরীয়, আসিরীয়, গ্রীক, আরব ও অটোমানদের শাসনাধীন। ইসলামের যুগে গাযা ছিল এক প্রাণবন্ত কেন্দ্র। ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে আমর ইবনে 'আছ রাহিমাহুল্লাহ-এর নেতৃত্বে মুসলিমরা শহরটি জয় করেন। এরপর এটি হয়ে ওঠে জ্ঞান ও সংস্কৃতির কেন্দ্র।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বযুদ্ধ ও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের পটভূমিতে শুরু হয় ফিলিস্তীনিদের দুর্বিষহ যাত্রা। ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে গাযা বারবার আক্রমণের শিকার হয়। ২০০৫ সালে 'ফলস ডেমোক্রেসির' নামে ইসরাঈল কিছু সেনা প্রত্যাহার করলেও বাস্তবে গাযা এক খোলা বন্দিশিবিরে রূপ নেয়।

গাযা ও ঢাকা: ভৌগোলিক সাদৃশ্য, ভাগ্যের বৈপরীত্য

বাংলাদেশের মতো গাযাও তিন দিক দিয়ে এক দেশের ঘেরাটোপে। বাংলাদেশের আড়াই দিক ভারত ঘিরে রেখেছে, আর গাযাকে মিসর ও ইসরাঈল। ঢাকার মতো আয়তনে ছোট হলেও, গাযার ভাগ্যে জুটেছে শুধু আগুন, বোমা আর মৃত্যুর গন্ধ।

গণহত্যার মুখে গোটা জাতি: যুদ্ধ নয়, নিঃসন্দেহে অপরাধ

ফিলিস্তীনে যুদ্ধ হচ্ছে না; এটি একটি পরিকল্পিত, ঠাণ্ডা মাথার গণহত্যা। যুদ্ধের নামে নারী, শিশু ও হাসপাতালকে টার্গেট করে বোমা ফেলা হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে ঘরবাড়ি, ধর্মীয় স্থাপনা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস।

বিশ্ব মিডিয়া, বিশেষ করে পশ্চিমা প্রচারযন্ত্র, ইসরাঈলের পক্ষ নিয়ে একপাক্ষিক সংবাদ প্রকাশ করছে। তারা 'মিথ্যা যুদ্ধের গল্প' ছড়িয়ে দিয়ে গাযার আসল রক্তাক্ত চিত্র আড়াল করছে। মানবতার ভাষা শেখায় যারা, তারাই আজ মানবতা হত্যা করছে।

একাত্মতার সময় এখনই: উম্মাহর দায়িত্ব এবং আহ্বান

মুসলিম উম্মাহর এই মুহূর্তে প্রয়োজন ঐক্য, সাহস এবং বাস্তব পদক্ষেপ। শুধু বিবৃতি দিয়ে দায়িত্ব শেষ করা যাবে না। দরকার দু'আর পাশাপাশি শক্ত অবস্থান। যারা ভারতের মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন চালায়, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া যেমন জরুরী, তেমনি ইসরাঈলি বর্বরতার বিরুদ্ধেও জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আজ যারা নির্যাতনের শিকার, তাদের কান্না আকাশ কাঁপায়, আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আমাদের উচিত এক দেহের মতো হয়ে মাযলূমদের পাশে দাঁড়ানো।

শেষকথা:

গাযা আজ আমাদের চোখের সামনে রক্তাক্ত হচ্ছে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ কেউ রেহাই পাচ্ছে না। অথচ বিশ্ব নীরব! এই নীরবতাই সবচেয়ে ভয়ংকর। আসুন! আমরা গাযার জন্য দু'আ করি, সচেতন হই, লিখি, বলি, প্রতিরোধ গড়ে তুলি। হে আল্লাহ! তুমি গাযার নির্যাতিত মানুষদের হেফাযত করো। তুমি মানবতার এই চরম সংকটে তাদের রক্ষাকারী হও- আমীন!

---

* চিকিৎসক, কলাম লেখক ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

ঈদ শোভাযাত্রার নামে তামাশা!

*-মুস্তফা মনজুর**

দেশে কী শুরু হলো? ঈদ শোভাযাত্রার নামে তামাশা! দৃঢ় কণ্ঠে এর প্রতিবাদ জানাই। ফেবুতে দেখলাম ঈদ শোভাযাত্রার ছবি। নানারকম মূর্তি নিয়ে র‍্যালি!!! মাআযাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এসব থেকে জাতিকে হেফাযত করুন।

যদিও ছবিগুলোতে কোনো আলেম বা মাদরাসার শিখার্থীদের উপস্থিতি নজরে পড়েনি। তারপরও এটি আমাদের ব্যর্থতা। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আমরা জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারিনি। তাছাড়া ঈদ উপলক্ষ্যে হওয়ায় এর স্পষ্টীকরণও জরুরী।

হ্যাঁ, দুচারজন দাড়ি-টুপিওয়ালা থাকলে বা মাদরাসার ছাত্র থাকলেই সব দোষ হুজুরদের দেওয়া যায় না। কারণ এর আয়োজনে কে ছিল, সেটা জানা গুরুত্বপূর্ণ। তারা নিশ্চয়ই আয়োজক ছিলেন না।

[ক]

ঈদ নিয়ে আনন্দ হবে, মিছিল হবে, র‍্যালি হবে—সেটাই স্বাভাবিক। নির্দোষ খেলাধুলা, শারঈ সীমার মধ্যে নাশীদ হবে—এসবই আনন্দের অনুষঙ্গ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সময়েও হয়েছে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের আনন্দে শরীক হয়েছেন, নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দিনটাকে ম্যাড়ম্যাড়ে করে দেননি। বরং স্বাভাবিক আনন্দের সব উপকরণই সে সমাজে বিদ্যমান ছিল। তাই বলে, ইসলাম আনন্দের নামে যা ইচ্ছা তা-ই করার অনুমতি দেয় না। মূর্তি বা ভাস্কর্য যে নামই দেন না কেন, এর কোনো অনুমতি ইসলামে নেই। তা ঈদের দিনে হোক বা দেশের জাতীয় দিবসে হোক। ইসলাম এক কথায় এগুলোকে হারাম বলে ঘোষণা করে।

তাও যে সে-ই হারাম না, কঠোর পর্যায়ের হারাম, যা শিরকের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই করা যাবে না। আর করলে এর পাপের মাত্রা ভয়াবহ।

[খ]

তো আমরা কী করলাম? জুলাই ২৪-এর স্বাধীনতার সুযোগে এর অপব্যবহার করলাম, স্রেফ অপব্যবহার।

আগে আমরা ঈদে মিছিল বের করতে পারতাম না, গুটিকতক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই এই উদযাপন, মিছিল সীমাবদ্ধ ছিল। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল না। এমনকি এত বাঁধভাঙাভাবে ঈদ উদযাপন করা যায়, সে ধারণাও অনেকের ছিল না। আর সে জনগণ যদি হয়, ইসলামপন্থি, কিংবা দাড়ি-টুপিওয়ালা, তাহলে তো কথাই নেই। পরিণাম গুম, খুন নয়তো আয়নাঘর।

এবার সে অবস্থা নেই। আমরাও হাফ ছেড়ে বেঁচেছি, ঈদ আনন্দকে উপভোগ করতে চেয়েছি। করেছিও।

কিন্তু গুটিকতক পাশ্চাত্য ও হিন্দু প্রভাবিত উর্বরমস্তিষ্কের বিকৃতমনা মানুষ এ নির্দোষ ঈদ উৎসবকেও বিতর্কিত করতে লাগল। এমন কিছু জিনিস আনন্দের অনুষঙ্গ হিসেবে ঢুকিয়ে দিল যা না ইসলামের, না এদেশীয় কালচার। কেন সেটা পরে বলছি। আগে দেখি, কী ছিল সে মিছিলে।

[গ]

এবারের ঈদ মিছিলে ছিল মোল্লা নাসিরুদ্দীন, আলীবাবা, আলাদিন, হাতি, বোরাক ইত্যাদি। সব ছবি আমার কাছে নেই। আবার কিছু ছবি কী জন্য মিছিলে চলে আসল, তা-ও বুঝিনি।

আচ্ছা, এসব কাদের কালচার? ইসলামের—মুসলিমের?

কস্মিনকালেও না। কারণ এরা রূপকথার চরিত্র কিংবা গল্পের আসরেই বেশি মানায়। তাও এসব গল্প কারা বলেন? হুজুররা? মাদরাসায় এসব পড়ানো হয়?

উত্তর– না।

এসব সেক্যুলারপন্থিদের গল্প। কেবল নামে মুসলিম হওয়ায় এদেরকেই মুসলিম কালচারের অংশ বানিয়ে দেওয়া হলো। মোদ্দাকথা, এসব চরিত্র কখনই প্রকৃতার্থে মুসলিম ও ইসলামকে প্রতিনিধিত্ব করে না।

দ্বিতীয়ত, এসব কি আমাদের দেশের ঐতিহ্য? এর উত্তরও– না। এসব আরব-পারস্যের চরিত্র এ স্বদেশে এসেছে ঠিকই কিন্তু এরা কোনোভাবেই এদেশের মাটি, সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে না।

অতএব, কোনো বিচারেই এবারের ঈদ মিছিলের এসব চরিত্র যৌক্তিকতার নিরিখে টেকে না।

[ঘ]

তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, এসব আমাদের সংস্কৃতি (নিশ্চিতভাবেই এসব আমাদের না, না মুসলিমদের না বাংলাদেশীদের)। এরপরও ইসলাম এসব মূর্তি বা ভাস্কর্য সমর্থন করে না। এসব বিনা দ্বিধায় হারাম।

ইসলামের যে কয়টি সার্বজনীন বিধান আছে, তার মধ্যে এটা অন্যতম। সকল ফিক্বহী মাযহাবই একমত, মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ হারাম। [এনিয়ে দালীলিক আলোচনা এখানে করছি না। পাঠক একটু খোঁজ করলেই পেয়ে যাবেন।]

মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণের বিরোধিতা আমরা আগেও করেছি; হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে থেলিসের মূর্তি কিংবা শেখ মুজিবের ভাস্কর্য নির্মাণের বিরুদ্ধেও আমরা বলেছিলাম। সেটাকে রাজনীতির মারপ্যাঁচে ফেলা দেওয়া হয়েছিল। আজকেও আমরা, হুজুররা, এর বিপক্ষে বলছি। এসব করা যাবে না।

এমনকি আপনারা যদি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মূর্তি বানাতে চান, সর্বপ্রথম আমরাই এর বিরোধিতায় মাঠে নামব। যদি খুলাফা কিংবা কোনো ইসলামী ব্যক্তিত্বের ছবি বানান, তাও

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমরাই মাঠে থাকব। অথচ এসব করতে পারলে আমাদেরই লাভ হওয়ার কথা, বিনা কষ্টে ইসলামের দাওয়াতটা প্রচার হয়ে যেত। কিন্তু আমরা নিষেধই করব, হারামই বলব। কারণ এটাই ইসলামের বিধান।

বি.দ্র.– অনেকে তুরস্ক, মিশর বা মালয়েশিয়াতে ভাস্কর্যের দোহাই দেন। ইসলাম সম্পর্কে জানলে এসব দিতেন না। আর সেসব দেশ কেন, কোনো দেশই আমাদের দলীল না। আমরা তো কেবল কুরআন-সুন্নাহর কথাই বলি।

শরীআর এই বিধান নিয়ে আপনাদের কোনো সন্দেহ থাকলে আপনারা কেবল একজন হক্বপন্থি আলেমের ফতওয়া আনুন, যিনি জায়েয বলেছেন। আমি পৃথিবীর লক্ষাধিক আলেমের ফতওয়া দিতে পারব যারা হারাম বলবেন। এমনকি সেসব দেশের, যাদের কথা আপনারা রেফারেন্স হিসেবে আনেন, সেসব দেশের আলেমদের ফতওয়াও দিতে পারব, যারা অকপটে হারাম বলেছেন।

[ঙ]

জানি না, যারা মূর্তির এসব আইডিয়া নিয়ে আসলেন, তাদের মাথায় কী আছে? মস্তিষ্ক নাকি...? নকলবাজ বোধহয় এদেরকেই বলে।

অথচ মূর্তি না বানিয়ে, সুন্দর সুন্দর অনেক রেপ্লিকাই তো বানানো যায়, প্রাণী না হলেই হলো। জাতীয়ভাবে এসব আয়োজনে দরকার পড়লে আমরা আইডিয়া দিয়ে দেব, তারপরও এমন হাস্যকর আইডিয়া নিয়ে জাতির সামনে নিজেদের ছোট না করার অনুরোধ রইল।

এবার কিছুটা আলোচনা করি কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে এসব করলেন। যদিও এসব আমার অনুমান, তবুও বুদ্ধিমান ও সচেতন পাঠক খুব একটা দ্বিমত করবেন না বলেই ধারণা করি।

(১) হতে পারে, খুব ভালো নিয়্যতে ঈদকে উৎসবে রূপান্তরিত করতেই ইসলামপ্রিয় কিছু মানুষ এমন করেছেন। এটাই সবচেয়ে ভালো ধারণা মুসলিমদের প্রতি।

কিন্তু এমন হয়ে থাকলেও এসব ভুল। কারণ—

প্রথমত, এটা ইসলামে হারাম।

দ্বিতীয়ত, তারা উলামায়ে কেরামের পরামর্শ নিয়েছেন বলে শুনিনি। এমনকি ধর্ম উপদেষ্টা মহোদয়ও জানতেন না বলেই জানি। অথচ ঈদ একটি ইবাদত। এতে নতুন কিছু জায়েয হলেও প্রবিষ্ট করানো যায় না। আর এগুলোতো মূর্তি— সরাসরি হারাম।

এমতাবস্থায়, তাদের সদিচ্ছার প্রমাণ তারা কেবল একভাবেই দিতে পারেন। তা হচ্ছে সংবাদ সম্মেলন করে ভুল স্বীকার করা ও জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া, ইসলাম সম্পর্কে জাতিকে বিভ্রান্ত করার কারণে। আর পাপের জন্য ক্ষমা আল্লাহর নিকটই চাইতে হবে। সেটা গোপনে হওয়াই ভালো।

(২) ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যাকারী লোকজন এসবের পেছনে ইন্ধন দিতে পারেন। লোকজ, লোকায়ত, সহজাত, সামাজিক ইসলামের এসব নানাবিধ ধারার লোকজন এসবের পেছনে কাজ করতে পারেন। অবশ্য তারাও যুক্তির বাইরে, কুরআন-হাদীছের কোনো দলীল এর সপক্ষে দিতে পারবেন না। এর কারণ ইসলামকে এর সীমানার বাইরে গিয়ে সহজীকরণ। এদের মূল উদ্দেশ্য ইসলাম মানা নয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ নয়; বরং বাপ-দাদার সূত্রে মুসলিম হওয়ায় সেটা উপেক্ষা করা যায় না, আবার প্রকৃতভাবে ইসলাম মানাও যায় না। এমতাবস্থায় নামমাত্র ইসলাম মানার স্বার্থে ইসলামকে বিকৃতরূপে ব্যাখ্যা করার দরকার হয়ে পড়ে।

স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, এসব ধারা-উপধারা ইসলাম নয়। বরং এর বিকৃত উপস্থাপনা মাত্র। এদের ষড়যন্ত্র থেকে সজাগ থাকাটাও ফরয, ঈমানের দাবি।

(৩) সেক্যুলারদের নীলনকশা। কারণ বৈশাখী উৎসব। ইতোমধ্যেই মঙ্গল শোভাযাত্রা নিয়ে কথা উঠেছে। ফলে সেটাকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা হিসেবে ঈদ আয়োজনে মূর্তির সংযোজন। যেন পরবর্তীতে পয়লা বৈশাখেও তার পক্ষে যুক্তির অবতারণা করা যায়। তাতে নামধারী ও আধুনিক কিছু মুসলিমকে তারা পাশে পাবে, আগেও পেয়েছে।

অথচ জেনে রাখা উচিত, আমরা মুসলিমরা সব ধরনের অনুষ্ঠানেই প্রাণীর মূর্তি, রেপ্লিকা, বা ভাস্কর্য সব কিছুরই বিরোধী। সেটা ঈদ হোক বা পয়লা বৈশাখ।

[চ]

আমরা আদতেই জানি না কে, কী নিয়্যতে এসব করেছে। আমরা এর নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু তদন্ত চাই। চাই, যারা এসবের পেছনে ছিল তাদের নাম জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোক, কেন এসব করেছেন এসবের ব্যাখ্যাও আমরা তাদের মুখ থেকে শুনতে চাই।

যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় কারণে এসব করা হয়ে থাকে, তবে কেবল ক্ষমা চাইলেই হবে না, তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিও আমরা জানাচ্ছি। ইসলাম ও মুসলিমদের কালচার নিয়ে ছেলেখেলা করার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার।

হ্যাঁ, এসবের পেছনে যদি বায়তুল মোকাররমের খত্বীবও থেকে থাকেন, তারও শাস্তি হওয়া উচিত [যদিও আমি শতভাগ নিশ্চিত উনি এমন করতে পারেন না]। অতএব, সুশীল, ক্ষমতাবান ইত্যাদির ছুতোয় যেন কোনো অপরাধী পার না পায়।

[ছ]

শেষ করছি, কিছুটা আপাত আফসোস নিয়ে।

আমি ঈদ আনন্দ আয়োজন বা মিছিল-র‍্যালির বিরোধী না। আমার, আমাদের বিরোধিতা কেবল প্রাণীর মূর্তি, গান-বাদ্য, ও অনৈসলামিক অনুষঙ্গের। আমরা চাই, ঈদ উদযাপিত হোক আনন্দময়ভাবে। কাউকে হেয় না করে, কাউকে কষ্ট না দিয়ে, কারও ধর্মের উপর আঘাত না করে। ঈদের আনন্দ হোক নির্দোষ, পবিত্র।

এতদিন উৎসব হয়নি। এবার বেশ কিছুটা হয়েছে, বাড়াবাড়িও হয়েছে। সামনে আমরা বাড়াবাড়িটা ছেঁটে ফেলে দেব ইনশা-আল্লাহ। আমাদের ঈদ ঈদের মতোই হবে। সকলে মিলে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা উদযাপন করব আমাদের ঈদ। আল্লাহ তাআলা সে তাওফীক্ব দিন- আমীন!

বাংলাদেশে আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর

*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে পাকিস্তানের ইতিহাসের যে যোগসূত্র, সেটিই মূলত আমাকে পাকিস্তান সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করে তুলে। পাকিস্তান সম্পর্কে অতীতে আমার কয়েকটি লেখাও প্রকাশিত হয়েছে। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় আমাদের একটি গ্রুপ ছিল ‘উর্দূ যাবান হামারি পেহচান’। এই গ্রুপের একমাত্র বাংলাদেশী সদস্য ছিলাম আমি; বাকীরা সবাই ভারতীয় ও পাকিস্তানী। আমাদের এই গ্রুপ থেকে প্রতি সপ্তাহেই কোনো না কোনো অনুষ্ঠান আয়োজিত হতো। সেই সুবাদে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানরত ভারত ও পাকিস্তানের ছাত্রদের একটা বিরাট অংশের সাথে আমার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। তন্মধ্যে আমার অন্যতম এক পাকিস্তানী ক্লাসমেট ফাওয়ান, যার কথা আমি আমার ফেসবুকের কিছু পোস্টেও উল্লেখ করেছি। তার সহযোগিতায় পাকিস্তানের বিভিন্ন আলেম-উলামার সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠে। তার সহযোগিতায় বহুবার আমি পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন বই-পুস্তক অর্ডার করেছি। তার মাধ্যমেই ২০২২ সালে রাজশাহীর সালাফী কনফারেন্সে আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর হাফিযাহুল্লাহ অনলাইন আলোচনা পেশ করেছিলেন।

আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর হাফিযাহুল্লাহ-কে আমরা তার পিতা আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর রাহিমাহুল্লাহ-এর সূত্র ধরে চিনলেও করোনার সময়ে তার শক্ত ও মযবূত ফতওয়া আমার আব্বুকে অত্যন্ত হিম্মত ও সাহস যুগিয়েছিল। করোনার সেই কঠিন লকডাউনের সময়েও তিনি মীনারে পাকিস্তান, লাহোরে হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে পায়ে পা মিলিয়ে জামাআতে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন। করোনার সময় সমগ্র বাংলাদেশে একমাত্র আমার পিতা শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ পায়ে পায়ে মিলানো, জামাআতে ছালাত আদায়, মসজিদ খোলা রাখা ইত্যাদি বিষয়ে শক্ত অবস্থানে ছিলেন। এই রকম ভয়াবহ ফেতনার সময় তার ইস্তিক্বামাতের জন্য শায়খ ইবতিসাম ইলাহী যহীরের ফতওয়া তার অবস্থানকে মযবূত করতে সহযোগিতা করেছিল। সেই সুবাদে তখন থেকে তিনি আমাদের নিকট আরও বেশি পরিচিত ছিলেন। ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকেই আমি তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলাম। প্রথমত আমরা ভেবেছিলাম তাকে রাজশাহীর সালাফী কনফারেন্সে দাওয়াত দিব। পরে দেখলাম রাজশাহীর সালাফী কনফারেন্সে অলরেডি সঊদী আরব থেকে চারজন বিদেশী মেহমান উপস্থিত হচ্ছেন, সেহেতু আল্লামা ইবহিসাম ইলাহী যহীরকে রূপগঞ্জ সালাফী কনফারেন্সে দাওয়াত দিলে তা বেশি ফলপ্রসূ হবে।

এদিকে বাংলাদেশে অবস্থানরত একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট টিম, যারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকেন—ডা. যাকির নায়েককে বাংলাদেশে নিয়ে আসার একটি পরামর্শ অনুষ্ঠানে আমি তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। তাদের সহযোগিতায় ও তাদের পাকিস্তান প্রতিনিধির মাধ্যমে আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীরের সকল ভিসা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। পাকিস্তানে অবস্থানরত বাংলাদেশী অ্যাম্বাসি থেকে সরাসরি ‘নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন’-এর সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ মুস্তফা কামালের সাথে কয়েকবার যোগাযোগ করে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এদিকে প্রতিনিয়ত যোগাযোগের এক পর্যায়ে একদিন আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর হাফিযাহুল্লাহ জানালেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলেহাদীছের মাধ্যমে বাংলাদেশের জমঈয়তে আহলে হাদীসের একটি অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তার কিছুদিন পর তিনি আবার জানালেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও তাদের সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার দাওয়াত প্রদান করা হয়েছে। আমি উত্তরে শায়খকে বললাম, আপনার পিতাকে সমগ্র বাংলাদেশের সকল আহলেহাদীছ ভালোবাসে আর আপনি প্রথমবার বাংলাদেশে আসছেন, সেহেতু সকল আহলেহাদীছের আপনার উপর হক্ব আছে। আপনি একটু বেশি দিন সময় হাতে নিয়ে আসেন, যাতে সকলের কাছে আপনি যেতে পারেন। তিনি সেভাবেই আমাকে টিকেট কাটার জন্য বললেন। আমি সেভাবেই তার টিকেট কেটে দিলাম, যাতে তিনি জমঈয়তের প্রোগ্রাম ও আন্দোলনের প্রোগ্রামে উপস্থিত হতে পারেন।

যেহেতু বাংলাদেশ থেকে সরাসরি পাকিস্তানের কোনো ফ্লাইট নেই, এজন্য শায়খের সাথে পরামর্শক্রমে শ্রীলংকায় ট্রানজিট দিয়ে শায়খের টিকেট কাটা হলো। শায়খ চাচ্ছিলেন যাতে

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

সঊদী আরবে ট্রানজিট দেওয়া হয়, তিনি উমরা করে পাকিস্তান ফিরতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু সেভাবে টিকেট মিলানো সম্ভব হয়নি। রওয়ানা দেওয়ার দিন শায়খ আমাকে মেসেজ করে জানান, শ্রীলংকায় ট্রানজিট মোটামুটি ১০ ঘণ্টার বেশি, তাই সেখানে কোনো হোটেল বুকিং দেওয়া যায় কি-না। আমি সাথে সাথে এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করে শায়খের জন্য শ্রীলংকায় হোটেল বুকিংয়ের ব্যবস্থা করি।

বাংলাদেশে আগমন ও বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ:

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, শুক্রবার: এদিন সকাল সাড়ে ১১টায় তিনি বাংলাদেশের শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। আমাদের এক পরিচিত দ্বীনী ভাইয়ের সহযোগিতায় আমরা শায়খের জন্য ভিআইপি ইমিগ্রেশন ও ভিআইপি লাউঞ্জের ব্যবস্থা করি। বিমান থেকে অবতরণের পরপরই সরাসরি শায়খকে ভিআইপি লাউঞ্জে নিয়ে আসা হয়। কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই ভিআইপি লাউঞ্জে বসে শায়খের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা হয়, আল-হামদুলিল্লাহ!

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর হাফিযাহুল্লাহ যেহেতু সর্বপ্রথম জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রোগ্রামে যাবেন, সেহেতু আমি নিজে থেকেই সম্মানিত জমঈয়ত সভাপতি ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী হাফিযাহুল্লাহ-এর সাথে যোগাযোগ করি, যাতে করে উনাকে আনা-নেওয়া ও থাকা-খাওয়ার বিষয়টি ভালোভাবে সমন্বয় করা যায়। উনি আমার প্রস্তাবে খুব ভালোভাবে সাড়া দিয়েছেন। বিমানবন্দরে শায়খকে রিসিভ করার পরপরই আমি জমঈয়ত সভাপতির সাথে যোগাযোগ করি। তিনি আমাকে শায়খ আব্দুর রব আফফানের নাম্বার দেন, যিনি জমঈয়তের পক্ষ থেকে শায়খের দায়িত্ব পালন করবেন। আমি শায়খ আব্দুর রব আফফানের সাথে যোগাযোগ করে শায়খকে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে নিয়ে যাই। সেখানে জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ শায়খকে স্বাগত জানান। উল্লেখ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সম্মানিত আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব হাফিযাহুল্লাহ-এর সুযোগ্য পুত্র 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান বড় ভাই ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব হাফিযাহুল্লাহ-এর সাথেও আমার নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছিল শায়খকে তাবলীগী ইজতেমায় নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে। যেহেতু সকলেই আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন, সেহেতু আমি হয়তো খুব একটা ভালো সমন্বয় করতে পারিনি। তারপরও আমার সাধ্যের জায়গা থেকে ইনছাফ বজায় রেখে সকলের সাথে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছি। সমন্বয় সাধনে আমার দিক থেকে কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে আমি সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

নিম্নে প্রায় দুই সপ্তাহব্যাপী শায়খের বাংলাদেশ সফরের সংক্ষিপ্ত সফরনামা তুলে ধরা হলো—

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, শনিবার: বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস আয়োজিত মহাসম্মেলনে ২য় দিন তিনি আলোচনা রাখেন। সেদিন উত্তরার মাদরাসাতুন নাসীহাতে পূর্ব নির্ধারিত একটি প্রোগ্রাম ও মিরপুর দাওয়া সেন্টারে আমার সাপ্তাহিক দারস থাকায় আমি শায়খের সফরসঙ্গী হতে পারিনি।

৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, রবিবার: শায়খ সর্বপ্রথম বংশাল বড় মসজিদে যান। সেখানে ছালাত শেষে অন্যান্য পাকিস্তানী মেহমানদের সামনে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করেন। সেখানে পাকিস্তানের মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের সম্মানিত আমীর প্রফেসর সিনেটর সাজিদ মিরসহ অন্যান্য মেহমানগণ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আওলাদ হাজী সাহেবের বাসায় দুপুরের লাঞ্চ শেষে জমঈয়তে আহলে হাদীসের যাত্রাবাড়ীস্থ অফিস দেখার জন্য যান। জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ সেখানে জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। সেখানে বিকেলের নাস্তা সেরে তিনি হোটেলে ফিরে আসেন।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, সোমবার: আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর রাহিমাহুল্লাহ ১৯৮৫ সালে যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন, তখন তিনি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী রাহিমাহুল্লাহ-এর দাওয়াতে শরীফবাগ কামিল মাদরাসা ধামরাইয়েও এসেছিলেন এবং বক্তব্যও দিয়েছিলেন। আজ দীর্ঘ ৪০ বছর পর সেখানে তার ছেলে আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীরও হাফিযাহুল্লাহ আলোচনা করেন। মাদরাসার অনেক শিক্ষক আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর রাহিমাহুল্লাহ-এর বাংলাদেশ সফরের স্মৃতিচারণ করেন।

এই দিন রাতেই আমার আম্মা আমাকে কল দিয়ে আমার ছোট ভাই আব্দুর রহীমের মেয়ে আয়েশার অসুস্থতার কথা জানান। পরদিন সকালে হঠাৎ তার মৃত্যুর খবর শুনে আমি শায়খদের হোটেলে রেখে সপরিবার রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। রাজশাহীতে জানাযা শেষে পুনরায় ঢাকা ফিরে এসে শায়খদের সাথে একসাথে রাতের খাবার গ্রহণ করি।

১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, মঙ্গলবার ও বুধবার: এই দুই দিন শায়খগণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, বৃহস্পতিবার: বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস পরিচালিত আরেকটি বড় প্রতিষ্ঠান পাঁচরুখী মাদরাসায় বাদ আছর একটি প্রোগ্রাম রাখা হয়। সেখানে

মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ও জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মানিত উপদেষ্টা জনাব এম এ সবুর সাহেবের নরসিংদীর বাসায় যান। সেখানে নাস্তা শেষে তার অধীনে নবনির্মিত মসজিদ আব্দুল আযীয প্রাঙ্গণে আয়োজিত একটি ইসলামী সম্মেলনে শায়খ আলোচনা পেশ করেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, শুক্রবার: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত সালাফী কনফারেন্সে তিনি জুমআর ছালাতে উপস্থিত হন। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন মাননীয় ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত সাবেক প্রফেসর শায়খ ড. যায়েদ আল-জুহানী ও শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ হাফিযাহুল্লাহ। উপস্থিত জনতাকে দেখে নিজ আগ্রহে আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর হাফিযাহুল্লাহ এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। অতঃপর ছাত্রদের সুন্দর গ্যালারি পরিদর্শন করেন। ছাত্রদের গ্যালারিতে তার বাবা আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর রাহিমাহুল্লাহ-এর জীবনী উর্দূ ভাষায় লিখে একটি দেয়ালিকা রাখা ছিল, যা দেখে তিনি যারপর নেই খুশি হন। উপদেষ্টা মহোদয়ও ছাত্রদের গ্যালারির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ঐদিন রাতে পুনরায় তিনি শ্রোতাদের সামনে তার আলোচনা পেশ করেন। রাতের আলোচনায় তার পিতার জীবনী ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, শনিবার: ঢাকা থেকে বিকেলের ফ্লাইটে একসাথে আমরা রাজশাহীতে গমন করি। সেখানে আমাদের বিদেশী মেহমানদের স্থায়ী মেহমানখানায় শায়খ বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, রবিবার: সকালে তিনি আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী পরিদর্শন করেন এবং বায়তুল হামদ জামে মসজিদে ছাত্রদের সামনে 'জ্ঞানার্জন'-এর উপর এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। সেখানে সম্মানিত মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুল খালেক সালাফীর সাথে তার হৃদ্যতাপূর্ণ সাক্ষাৎ হয়। তার নানা হাফিয মুহাম্মাদ গোন্দলবীর অন্যতম একজন ছাত্র হচ্ছেন শায়খ আব্দুল খালেখ সালাফী হাফিযাহুল্লাহ। এছাড়া ভারতের শিক্ষকমণ্ডলী বিশেষ করে জামি'আহ সালাফিয়া বানারাসের সাবেক শায়খুল হাদীছ মুফতী ইউসুফ মাদানীসহ অন্যান্য শিক্ষকগণের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল অ্যাকাডেমিক ভবন ও মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী আবাসিক ভবন, মাসিক আল-ইতিছাম অফিস, আরবী পত্রিকা মাজাল্লাতুস সালাফ অফিস, আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস ইত্যাদি কার্যক্রম দেখে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-কে একটি সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে মন্তব্য করেন।

বিকেলে শায়খ 'নিবরাস মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়'-এর জায়গা পরিদর্শন করেন। সেখানে তাজা মাছের বারবিকিউ করা হয় এবং বিভিন্ন রকমের দেশী ফলমূল ও পিঠার ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে খেজুরের রস পান করে শায়খ খুবই খুশি হন। বাংলাদেশের মাছের স্বাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, সোমবার: ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগের ভিত্তিতে আমরা বিকেল ৫টার দিকে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর উদ্দেশ্যে বের হই। মারকাযে প্রবেশের পর ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজিব ভাইসহ আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ শায়খকে রিসিভ করেন। আন্দোলন অফিসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সম্মানিত আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব হাফিযাহুল্লাহ-এর সাথে আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর হাফিযাহুল্লাহ-এর সাক্ষাৎ হয়। আন্দোলন নেতৃবৃন্দ সেখানে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরেন। বিশেষ করে বড় ভাই মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলামের লেখা আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর রাহিমাহুল্লাহ-এর জীবনী এবং আরেক বড় ভাই ড. মুখতার আহমাদের আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর রাহিমাহুল্লাহ-এর জীবনীর উপর কৃত পিএইচডি থিসিসের বিষয়টি জেনে শায়খ প্রচণ্ড খুশি হন।

মাগরিবের ছালাতের পর মারকাযের কেন্দ্রীয় মসজিদে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে শায়খ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। সমাপনী বক্তব্যে প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব হাফিযাহুল্লাহ উর্দূ ভাষায় আবেগঘন এক বক্তৃতা পেশ করেন। বক্তৃতার শেষের দিকে তিনি বান্দা নাচিজকে ফারযান্দ সম্বোধন করে শুকরিয়া আদায় করেন। আমি নিজেকে যে শুকরিয়ার কখনোই যোগ্য মনে করি না। তার মতো বড় মানুষ তার জায়গা থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের উদার মন ও তাওয়াযু প্রদর্শন করেছেন। *হাফিযাহুল্লাহ!*

আলোচনা শেষে আন্দোলন অফিসে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে আল্লামা ইবতিসাম ইলাহী যহীর হাফিযাহুল্লাহ-এর রাজশাহী সফর শেষ হয়।

(ইনশা-আল্লাহ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ব্যভিচারের ধারেকাছেও যেয়ো না!

-রাকিব আলী*

দুইজন নন-মাহরামের কথোপকথন, অতঃপর...
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একটি গ্রুপে এক মেয়ে সবসময় দ্বীনী বিষয়ক লেখনী পোস্ট করে থাকে। তার শেয়ার করা এসব পোস্ট অনেকেই পড়ে। তার পোস্টে নিয়মিত লাভ রিঅ্যাক্ট দেওয়া এক ছেলে হঠাৎ একদিন তার মেসেঞ্জারে নক দিয়ে বলল,
—আস-সালামু আলায়কুম।
—ওয়াআলাইকুম আস-সালাম।
—কেমন আছেন আপনি?
—আল-হামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আপনি?
—আল-হামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আপনি ইসলামী বেশ কয়েকটি গ্রুপে দ্বীনী অনেক কনটেন্ট শেয়ার করেন। আমি নিয়মিত পড়ি। অনেক ভালো লাগে আপনার কনটেন্টগুলো। মাশা-আল্লাহ! অনেক কিছু শিখতে পারি।
—দু'আ করবেন।
—অবশ্যই। আচ্ছা, আপনার পুরো নামটা যেন কী?
—সাদিয়া বেগম ইভা।
—মাশা-আল্লাহ! অনেক সুন্দর নাম! এই নামের অর্থটাও বেশ।
—অর্থটা কী?
—সুখী।
—জানা ছিল না। অর্থটা জানানোর জন্য থ্যাংকস।
—আচ্ছা, কী করছেন এখন?
—এই তো শুয়ে আছি।
কথাগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগুচ্ছে এবং অপ্রয়োজনীয় কথার দিকে যাচ্ছে। আর এভাবেই কিন্তু একটা হারাম রিলেশনশিপের সূত্রপাত হয়। এভাবে বেশ কয়েকদিন ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করা কিংবা দ্বীনী কোনো আলোচনা করার মতো সফট কথোপকথনের পর হঠাৎ একদিন বলে বসে,
আচ্ছা, আমরা কি ফ্রেন্ড হতে পারি?
—ফ্রেন্ড তো আছিই।
—হুম, সেটাই তো কথা। আচ্ছা, কিছু মনে না করলে আপনার একটি ছবি দেওয়া যাবে? দেখেই ডিলেট করে দেব।
—কী বলেন এসব?
—মাফ করবেন, লাগবে না তাহলে।
—কিন্তু যদি...
Look! Shatan is in the business now. দেখুন, শয়তান এই মাত্র তার আসল টোপ ফেলেছে। শুরুতে কিন্তু সে এই টোপ ফেলেনি। সে ধীরে ধীরে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। লক্ষ করে দেখুন, শুরুটা হয়েছিল সালাম দিয়ে আর এভাবে যখন হারাম সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে, তখন শেষটা হচ্ছে যেনা দিয়ে। নাঊযুবিল্লাহ!
আজকের ফ্রি-মিক্সিং এর কঠিন যুগে যুবক-যুবতিদের মধ্যে অহরহ ঘটতে থাকা ঠিক এই ধরনের কথোপকথন আমাকে কুরআনের একটি আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছে, উপলব্ধি করিয়েছে কেন এই আয়াতের এত গুরুত্ব। একইসাথে আয়াতটিতে রবের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস আরও বহুগুণ বেড়ে যাওয়ার মতো বিষয় রয়েছে। জানেন, কোন সে আয়াত? সেই আয়াত নিয়ে স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 'তোমরা যেনার ধারেকাছেও যেয়ো না। এটা অবশ্যই অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ' *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৩২)*।

এই আয়াতটি নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছি। আল্লাহ তো বলতে পারতেন যে, যেনা করো না; কিন্তু সেটা না বলে আল্লাহ বলেছেন, যেনার ধারেকাছেও যেয়ো না। এই 'ধারেকাছে না যাওয়ার' মানে কী, জানেন? এর মানে হচ্ছে যে কথা বা কাজ দ্বারা যেনার দরজায় প্রবেশ করা হয়, হোক সেটা অনেক ভালো কথা, তবুও সেই কথা বা কাজ না করতে আল্লাহ জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন। কারণ আল্লাহ ভালো করেই জানেন তাঁর বান্দা কী করলে কী হবে। তিনি জানেন তাঁর বান্দা শুরুতেই যেনার মূল কাজ করবে না। আস্তে আস্তে সে সেটার দিকে এগুবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা যেনা নয়, যেনার সূত্রপাত হয় এমন কিছু থেকে আগে থেকেই দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

উপরের কথোপকথনের কথাই ধরুন। সে কিন্তু প্রথমেই যেনার কিছু করেনি। শুধু সালাম দিয়েছে মাত্র, যা আপাতদৃষ্টিতে খুবই ভালো কাজ। কিন্তু এক্ষেত্রে এই 'সালাম' তাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে অর্থাৎ তার শেষ পরিণতি কী হতে পারে, তা তো আল্লাহ ভালো করেই জানেন। আল্লাহ ভালো করে জানেন বলেই এখানে সালাম দিতে নিষেধ করছেন। কারণ এই 'সালাম' দেওয়া মানে আপনি যেনা করছেন না ঠিকই, কিন্তু আপনি যেনার ধারেকাছে চলে যাচ্ছেন। আপনি উপরের কথোপকথনটির পরবর্তী কথাগুলোর দিকে খেয়াল করলে স্পষ্ট দেখতে পাবেন যে, কীভাবে ধীরে ধীরে যেনার দিকে যাওয়া হচ্ছে। প্রতিটি হারাম রিলেশনশিপের শুরুর দিকের কার্যকলাপ কিন্তু এভাবেই হয়। এজন্য ফেতনার এই সময়ে কোনো পরপুরুষ বা পরনারীকে শুধু শুধু সালাম কিংবা জবাব দেওয়াই উচিত নয়। অন্তত উপরের কথোপকথনটি আমাদেরকে তাই বলছে।

মূলত, 'লা তাক্বরাবুয যেনা' অর্থাৎ তোমরা ব্যভিচারের ধারেকাছেও যেয়ো না— এই আয়াতটির গভীরতা বোঝানোর জন্য উপরের কথোপকথনটি টেনে আনা। এই আয়াত নিয়ে আমি যত ভাবি, ততই অবাক হই। একইসাথে আল্লাহর অস্তিত্বকে আরও বেশি উপলব্ধি করি। অবশ্যই আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহর কুরআন সত্য। বিশ্বাস করুন, ছোট্ট এই আয়াতটি ঈমান বৃদ্ধির মতো আয়াত। সুবহানাল্লাহ! এই আয়াতটির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারলে কোনো মুমিন অশ্রুসিক্ত না হয়ে পারবে না। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

* আম্বরখানা, সিলেট।

ভ্রাতৃত্ববোধ

-এম. এফ. রহমান বিন সিরাজ*

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষকে দৈনন্দিন জীবনে একে অপরের সাথে সামাজিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়। একে অপরের সহযোগিতায় মানুষ অনুভব করে অসীম সুখ ও সীমাহীন শান্তি। সমাজ হয় সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ। ভ্রাতৃত্ব রক্ষায় ইসলাম সবচেয়ে বেশি তাগিদ দিয়েছে। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় তারই কিছু নমুনা উপস্থাপন করার প্রয়াস পাব, ইনশা-আল্লাহ!

ইসলাম এক মুসলিমের সাথে অপর মুসলিমের ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতি কেমন হওয়া কাম্য, তার একটি স্বরূপ উপস্থাপন করেছে। হাদীছে এসেছে,

عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

নু‘মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তুমি মুমিন ব্যক্তিদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুকম্পার ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো দেখবে। যখন দেহের কোনো অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়, তখন সমস্ত শরীর তার জন্য অনিদ্রা এবং জ্বরে আক্রান্ত হয়’।[১]

মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মমত্ববোধের এমন চিত্র ইসলাম উপস্থাপন করেছে, যার দ্বারা একে অপরের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা নির্মূল হয়ে যায়। আবশ্যক হয়ে যায় একে অপরের মাঝে ভালোবাসা ও মমত্ববোধ।

তারপরও অনেককে দেখা যায় যে, কোনো এক নিতান্ত মামুলি বিষয়ে দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে একে অপরের সাথে মাসকে মাস, বছরকে বছর অতিবাহিত করে কোনো রকম কথা ছাড়াই। তাদের মাঝে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে প্রথমে সম্পর্কের হাত বাড়ায় এবং সর্বপ্রথম সালাম দেয়। তাহলে শুনুন! শান্তি ও ভালোবাসার অসম্ভব একটি দৃষ্টান্ত মহামানব মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সেই মর্মস্পর্শী বাণী।

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ.

আবূ আইয়ূব আনছারী রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয় তিন রজনির অধিক তার ভাইকে এভাবে পরিহার করা যে, তাদের সাক্ষাৎ হয় অতঃপর একে অপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তাদের মাঝে উত্তম হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম দেয়’।[২]

উল্লিখিত হাদীছের ভাষায় স্পষ্ট হয় যে, কোনো ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে না যে, সে তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে দ্বন্দ্বের কারণে তিন দিন পর্যন্ত কথা না বলে থাকবে। কোনো ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য কীভাবে সম্ভব যে, এই সুস্পষ্ট ভাষা বুঝা সত্ত্বেও এবং নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত হওয়ার পরও তাঁর সুস্পষ্ট কথাকে অমান্য করে, তা গুণীজনের বোধগম্য নয়।

একে অপরের ভ্রাতৃত্ব রক্ষার্থে ইসলামে এক অভূতপূর্ব ও অত্যন্ত সুন্দর বিধান বর্ণিত আছে, যা পারে একে অপরের বিদ্বেষকে মিটিয়ে দিতে ও হিংসাকে বিলীন করতে। যে বিধানকে প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উচিত মযবূতভাবে আঁকড়ে ধরা এবং প্রত্যেক মুসলিমের আবশ্যক ইসলামের এই চমৎকার নিদর্শনকে সমুন্নত রাখা ও তা পালন করা। তা হচ্ছে একে অপরের সাথে সালাম বিনিময় করা। যেমনটি বলেছেন শান্তির প্রচারক, অনুপম আদর্শের অধিকারী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম। আবূ উমামা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ ‘আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম দেয়’।[৩]

হে আমার প্রিয় ভাই! কে না চায় তার প্রতিপালকের নিকট প্রিয়তম হতে? তাহলে এই সামান্য এবং শ্রমহীন কাজে কেন এত কুণ্ঠাবোধ? কেন এত অবহেলা?

তাহলে কি তা আত্ম-অহমিকা?

আবার অনেকে সালাম গ্রহণ করতে অবহেলা করে, যা কোনোমতেই একজন মুমিন ব্যক্তির থেকে কাম্য নয়। কারণ সালামের জবাব দেওয়া তো মহান রবের পক্ষ থেকে আদেশ। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ ‘যখন তোমরা

---

* শিক্ষার্থী, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬০১১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৬।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬০।

৩. তিরমিযী, হা/২৬৯৪; আবূ দাঊদ, হা/৫১৯৭; মিশকাত, হা/৪৬৪৬, হাদীছ ছহীহ।

সালাম ও অভিবাদন প্রাপ্ত হও, তবে তোমরাও তা হতে অতি উত্তম সম্ভাষণ অথবা (অনুরূপ সম্ভাষণ) ফিরিয়ে দাও, নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী' *(আন-নিসা, ৪/৮৬)*।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে যে সালাম আমরা প্রাপ্ত হব, তার থেকেও উত্তমভাবে তা ফিরিয়ে দিতে বলেছেন। আর আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা অতি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়েও হিসাব গ্রহণকারী। আমরা যদি এর মাধ্যমে অহংকার প্রকাশ করে থাকি, তাহলে তিনিই এই বিষয়ে অধিক অবগত।

আমাদের বড় সমস্যাগুলোর একটা হলো- আমরা প্রয়োজনের থেকে বেশিই আত্মমর্যাদাবান মনে করি নিজেদেরকে। আমরা মনে করি, আমি কেন আগে তার সাথে কথা বলব? অথচ প্রয়োজনের সময় হলে ঠিকই তার নিকটেই যাই। তাহলে আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সেই সৃষ্টির সেরা ও মহামানবের কথা, যিনি সকলের কাছেই হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় পরিচিত। যিনি ছোটদের আগেই সালাম দিয়েছেন, যিনি ছোটদের সাথে কৌতুকের ছলে আলাপ করেছেন, যিনি এমন কারবার করেছেন যা আমাদের নিকট আশ্চর্যজনক হলেও তার নিকট ছিল স্বাভাবিক। তিনিই মহান সেই ব্যক্তি মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম। আমরা কি তাঁর থেকেও অধিক মর্যাদাবান ও সম্মানের অধিকারী? আমাদের সকলের উচিত আগে কথা বলা এবং হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় কথা বলা। কেউ আগে কথা বললে তাকে বিদ্রুপ না করা এবং এটাকে তুচ্ছজ্ঞান না করা। যেমনটি মর্যাদাবান ব্যক্তি মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বাণী থেকে আমরা জানতে পারি। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ «لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ».

আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ভালো কাজকেই তুচ্ছজ্ঞান করবে না। যদিও সেটা তোমার কোনো ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাৎ করা হয়'।[৪]

আমাদের সকলেরই উচিত, আমরা এই ছোট কাজটাকে তুচ্ছ মনে না করে তার প্রতি আমল করা, যার মাধ্যমে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক দৃঢ় হবে ও সুন্দর হবে।

আর ভ্রাতৃত্ব রক্ষার্থে কারো উচিত নয় যে, সে তার ভাই সম্পর্কে কোনো অমূলক কুধারণা, গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান, পশ্চাতে নিন্দা, ঠাট্টা, বিদ্রুপ, দোষারোপ, মন্দ নামে ডাকার মতো গর্হিত কাজ করবে। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে সূরা আল-হুজুরাত এর ১১-১২ নম্বর আয়াতে।

এসব তো নমুনা মাত্র। এগুলো ছাড়াও অসংখ্য জায়গায় বিভিন্নভাবে ইসলামের পরতে পরতে মুসলিমের একে অপরের মৌলিক অধিকার, ভ্রাতৃত্ব, একে অপরের প্রতি দয়া, ভালোবাসা, মমতার বর্ণনা সুবিন্যস্তভাবে বর্ণিত রয়েছে। এসব বিষয় আবশ্যক করে প্রত্যেকের প্রতি ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, যা আমাদের সামাজিক জীবনকে সীমাহীন সুখকর করে তোলে। যার মাধ্যমে দূরীভূত হতে পারে সমাজের অনাচার ও অত্যাচার। এভাবে সকলেই একে অপরের সাথে দ্বন্দ্ব ভুলে হয়ে ওঠে দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিশীল। তারা একে অপরের ব্যথায় হয় ব্যথিত। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তার মুসলিম ভাইয়ের মৌলিক অধিকারের প্রতি লক্ষ রাখা। আল্লাহ আমাদেরকে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

রকমারি ফুলের মধু
- সরিষা ফুলের মধু
- লিচু ফুলের মধু
- বরই ফুলের মধু
- কালোজিরা ফুলের মধু
- মিক্স ফুলের মধু
- পাহাড়ী ফুলের মধু
- সুন্দরবন বিখ্যাত খলিশা ফুল
- চাকের মধু

অন্যান্য জিনিস
- আখের গুড়
- মৌসুমের খেজুরের গুড়
- মধুময় বাদাম
- উন্নত মানের খেজুর
- সরিষার তেল
- কালোজিরা তেল
- জয়তুন তেল
- যবের ছাতু
- দানাদার ঘি
- বিভিন্ন ইসলামী বই পাওয়া যায়

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন!
০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২
প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন
ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun
১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬২৬।

তীব্র গরমে নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব: প্রয়োজন সাবধানতা ও সচেতনতা

*-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ**

গ্রীষ্মের বিরূপ আবহাওয়ার প্রভাব বিরাজ করছে বাংলাদেশে। এসময়ে অতিরিক্ত গরমের ফলে বাড়ছে স্বাস্থ্য সমস্যা। ঘামাচি, চুলকানি, পানিস্বল্পতা, হিটস্ট্রোক, স্কিন বার্ন, ডায়রিয়া এমনকি বিভিন্ন কিডনিজনিত সমস্যাতেও আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। গ্রীষ্মের গরমে এসব সমস্যা ও এর সমাধানে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

পানিশূন্যতা: এই গরমে ঘামে শরীর থেকে প্রচুর লবণ-পানি বের হয়ে যায় বলে শরীরে পানিশূন্যতা দেখা দেয়। সাধারণত এর ফলে শরীরের রক্তচাপ কমে যায়, দুর্বল লাগে, মাথা ঝিমঝিম করে। পানিস্বল্পতা গরমের খুবই সাধারণ সমস্যা হলেও অবহেলা করলে তা মারাত্মক হয়ে যেতে পারে। এ সময়ে শরীরের কোষ সজীব রাখতে প্রচুর পানি খেতে হবে। লবণের অভাব পূরণ করতে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়া যেতে পারে। শরীরে পানি কম হলে প্রস্রাব হলুদ ও পরিমাণে কম হবে এবং জ্বালাপোড়া বা প্রস্রাবের সংক্রমণ হতে পারে। যে পর্যন্ত না প্রস্রাব স্বাভাবিক রং ফিরে পাবে, সে পর্যন্ত পর্যাপ্ত পানি খেয়ে যেতে হবে। পানির সঙ্গে অন্যান্য তরল যেমন ফলের রস খাওয়া যেতে পারে। ভাজাপোড়া, অধিক তেল, মসলাজাতীয় খাবার একদমই এড়িয়ে যেতে হবে। সাধারণ খাবার যেমন ভাত, সবজি, মাছ ইত্যাদি খাওয়াই ভালো। খাবার যেন টাটকা হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। চা ও কফি যথাসম্ভব কম পান করা উচিত।

ত্বকের সমস্যা: প্রখর রোদে ত্বকে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ সময়ে খোলা আকাশের নিচে হাঁটাচলা বেশি হলে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি ত্বক ভেদ করে কোষের জন্য বিপদ ডেকে আনে। ত্বকে ফোসকা পড়াসহ ত্বক বিবর্ণ হতে পারে। তাই এ সময়ে বাইরে বের হলে অবশ্যই সানস্ক্রিন ক্রিম ত্বকে মেখে বের হতে হবে। এ সময়ে চোখে সানগ্লাস পরতে হবে। ছাতা ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে। যথাসম্ভব হালকা রঙের কিংবা সাদা রঙের পোশাক পরা গরমের জন্য উত্তম। ঘামাচি নামক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার হতে পারে। অনেক সময় চুলকাতে থাকে বলে ত্বকে ঘা দেখা দেয়। এ জন্য প্রয়োজন শরীরে যাতে ঘাম ও ধুলোবালি না জমে, সেদিকে লক্ষ রাখা। ঘামাচি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে কখনো সিনথেটিক পোশাক পরা চলবে না। সব সময় সুতির ঢিলা পোশাক পরতে হবে। শরীরে যাতে ঘাম না জমে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পরিষ্কার পানি দিয়ে গোসল করতে হবে। প্রয়োজনে একাধিকবার গোসল করা যেতে পারে।

ডায়রিয়া: গরম এলেই ডায়রিয়ার প্রকোপ বাড়ে। দুই বছরের নিচে শিশুদের ডায়রিয়ার প্রধান কারণ হলো, রোটা ভাইরাসজনিত সংক্রমণ। চারদিকে ভয়াবহ গরমে যখন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, ঠিক এই সময় চোখের সামনে যে ঠাণ্ডা পানীয় পাক না কেন, তা দিয়ে গলা ভেজানোতেই মন অস্থির হয়ে যায়। দেখার সময় থাকে না, তা বিশুদ্ধ বা দূষিত কি না। এভাবে এই খাদ্য ও পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে অনেকে। রাস্তাঘাটের অধিকাংশ খাবার দূষিত থাকে, তাই গরমে এই দূষিত খাবার খেয়েই অনেকে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে থাকে। একটু সচেতন হলে এটি এড়ানো যায়। এই যেমন হাত পরিষ্কার করে খাবার খেলে, বাসি, পচা খাবার না খেলে।

সর্দিজ্বর: শিশুদের নিয়ে খুব রোদে ঘোরাঘুরি করলে বাইরের তাপ ও শরীরের তাপের মধ্যে সমতা থাকে না বলে জ্বর হতে পারে। এ জন্য কড়া রোদে তাদের চলাফেরা করতে না দেওয়াই ভালো। জ্বর হলে শরীরে সঞ্চিত শর্করা বেশি হারে খরচ হতে থাকে। এ সময় শরীর থেকে প্রচুর পানি, ঘাম ও প্রস্রাব বেরিয়ে যায়। এ অবস্থায় শিশুকে ফলের রস দিলে খাবারের রুচি বাড়বে এবং স্যুপ খাওয়ালে ক্ষুধা বাড়বে। ফলে শিশুরা খেতে আগ্রহী হবে।

ছত্রাক সংক্রমণ: গরমে শরীরে ঘাম জমে ছত্রাক সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। ঘাম শরীরের বিভিন্ন ভাঁজে বিশেষ করে কুঁচকিতে, আঙুলের ফাঁকে ও জননাঙ্গে জমা হয়ে সেখানে ছত্রাক সংক্রমণের পথ বিস্তার করে দেয়। তাই এ সময়ে ছত্রাক সংক্রমণ এড়াতে হলে শরীরের ভাঁজগুলোতে ঘাম জমতে দেওয়া যাবে না। প্রয়োজনে ছত্রাকবিরোধী পাউডার এসব স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত: মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস নামের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী অংশটি শরীরের তাপ ৩৬ থেকে ৩৯-এর মধ্যে রাখার চেষ্টা করে থাকে। যদি দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়, তৎক্ষণাৎ হাইপোথ্যালামাস সব রক্তনালি, শিরা

---

* চিকিৎসক, কলাম লেখক ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

ও উপশিরার প্রসারণ ঘটায়। রক্তনালিগুলোর প্রসারণের ফলে শরীরে রক্ত চলাচল বাড়ে, যা শরীরকে ঠাণ্ডা রাখতে সহায়তা করে।

অতিরিক্ত দাবদাহে আমাদের মস্তিষ্ক ও রক্তনালির মধ্যকার ঝিল্লি ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। ফলে এমাইনো অ্যাসিড ও ক্ষতিকারক আয়ন জমে মস্তিষ্কে প্রদাহের সৃষ্টি হয়। গরমে আমাদের মেজাজ তিরিক্ষি, অস্থিরতা, মানসিক চাপ বেড়ে যাওয়া, দুশ্চিন্তা, সিজোফ্রেনিয়া, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। গবেষণায় দেখা যায়, দাবদাহের সময় আত্মহত্যার পরিমাণও বেড়ে যায়।

ফুসফুসের রোগব্যাধি: অত্যধিক তাপে বাতাসের দূষিত পদার্থগুলোর চলাচল মন্থর হয়ে পড়ে। এসব দূষিত পদার্থ, যেমন- ওজোন, যানবাহন নিঃসৃত কেমিক্যাল, কলকারখানার ক্ষতিকারক গ্যাস ইত্যাদি সূর্যতাপের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায় এবং ফুসফুসের কার্যক্ষমতায় ক্ষতিসাধন করে। ফলে শ্বাসযন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদি রোগাক্রান্তদের সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। গবেষণায় দেখা যায়, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিশ্বে প্রায় ২২ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে থাকে।

হৃদরোগের ঝুঁকি : অতিরিক্ত গরমে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এই তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য শরীরের রক্তনালিগুলো প্রসারিত হয়ে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে। ফলে রক্তচাপ কমে যায়। এ ছাড়া শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে হার্টকে দ্রুত সংকোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি ঘটাতে হয়। কিন্তু কম রক্তচাপে হার্ট দ্রুত ও বেশি রক্ত সঞ্চালন করতে গিয়ে এক পর্যায়ে হার্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও দাবদাহের ফলে বেশির ভাগের মৃত্যু ঘটে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট জটিলতার কারণে।

মাংসপেশিগুলোতে দুর্বলতা: তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে গেলেই মাংসপেশিগুলোর কার্যক্রম হ্রাস হয়ে শরীরে অবসাদগ্রস্ততার উদ্ভব ঘটে। এ অবস্থাকে 'তাপ শ্রান্তি' বলা হয়ে থাকে। তাপ শ্রান্তির প্রধান উপসর্গ হচ্ছে মাথা ঘোরানো, চোখে ঝাপসা দেখা, তৃষ্ণা পাওয়া, বমি ভাব কিংবা বমি হওয়া, বুক ধড়ফড় করা, দুর্বল লাগা, চলনশক্তিহীনতা ইত্যাদি। এরপরও যদি তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং তা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায় তখন চামড়া শুকিয়ে তাপ সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে। এ অবস্থাকে হিট স্ট্রোক বলা হয়। যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা না করলে আক্রান্ত ব্যক্তি মূর্ছা যেতে পারে, অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারে, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

গরমে সুস্থ থাকতে করণীয়:

১. গরমের দিনে সহজপাচ্য ও স্বাস্থ্যকর খাবার খান।

২. যথাসম্ভব ইনডোর বা শীতল স্থানে খেলাধুলার ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা করুন।

৩. বাসস্থানে যথাসম্ভব আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন।

৪. এ সময় দূরপাল্লার ভ্রমণ কিংবা আউটডোর কর্মকাণ্ড সীমিত রাখুন।

চাই স্বাস্থ্যকর খাবার:

১. সাধ্যমতো ফল, যেমন- তরমুজ, আনারস, শসা, বাঙ্গি, লিচু, জামরুল ইত্যাদি খাবেন।

২. খাদ্যতালিকায় চিড়া, দই ও কলা রাখতে পারেন। তা শরীরকে ঠাণ্ডা রাখবে এবং পুষ্টির চাহিদাও পূরণ করবে।

৩. লাউ, পটল, শসা, চিচিঙ্গা, গাজর, পেঁপে, পালংশাক পানিশূন্যতা দূর করতে দারুণ সহায়ক।

৪. ভাত, ডাল, শাকসবজি, মাছ, সালাদ প্রভৃতি খাবারই এ সময় উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর।

বর্জনীয় অভ্যাস ও খাবারদাবার:

১. দিনের স্বাভাবিক মেন্যুতে অতিরিক্ত তেল, মসলাদার খাবার রাখবেন না। ভাজাপোড়া খাবার যেমন- পুরি, শিঙাড়া, সমুচা, ফাস্ট ফুড ইত্যাদি এড়িয়ে চলুন।

২. উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার যেমন- গরু বা খাসির মাংস, ডিম, ঘি, মাখন, কোমল পানীয়, চকোলেট, মিষ্টি খাওয়া সীমিত করুন।

৩. গরমের সময় খোলা জায়গায় বিক্রি করা খাবার, পানি, শরবত, আখের রস ইত্যাদিতে দ্রুত রোগ-জীবাণু ছড়ায়। এসব পরিহার করতে হবে।

৪. তীব্র গরমে অতিরিক্ত হাঁটা, ব্যায়াম, পরিশ্রম এবং অধিক পরিমাণে খাদ্যগ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তা পরিহার করুন।

হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতিতেও গরম সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান রয়েছে।

পরিশেষে বলতে চাই, এই গরমের সময় মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা বেশি দেখা দেয়। এ সময়ে সতর্ক হয়ে না চললে যেকোনো সময়ই আপনি অসুস্থ হতে পারেন। তাই এই গরমে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে জীবনযাপন করুন। আল্লাহ আমাদের সুস্থ রাখুন; ভালো রাখুন।

আর কতকাল জ্বলবে আগুন

-আনিছুর রহমান
নামাজগড়, বগুড়া।

আর কতকাল জ্বলবে আগুন
ফিলিস্তীন গাযাতে,
মুসলিম তোরা জেগে উঠো,
হায়েনাদের হালাক করো ধরাতে।
ফিলিস্তীনে জ্বলবে বাতি
পতাকা উড়বে কালেমার,
মুসলিম মোরা ভয় করি না
উম্মত যে রাসূলের, তাঁরই তাঁবেদার।
আমার ভাইয়ের বুকে আগুন
সারা বিশ্বে মুসলিমের,
হুংকার দাও জিহাদ করো
ভয় ও শঙ্কা নাই মোদের।
ঐক্যবদ্ধ হও মুসলিম
এক আল্লাহর তাকবীর দাও,
যুদ্ধ জিহাদ করো সবে
শহীদ গাজী তামান্না চাই।
৭০ বছর ধরে জ্বলছে আগুন
এবার মোরা থামাতে চাই,
ফিলিস্তীন আযাদ করে
ধরায় মোরা বাঁচতে চাই।
হায়েনারা হবে লাঞ্ছিত,
হবে তারা ঘৃণিত বঞ্চিত।

সোনার জীবন

-মো. আবু জার গিফারী জিহাদ
শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

সোনার জীবন গড়তে হলে
সঠিক দ্বীনকে জানো,
মন্দ পথকে ভুলে তুমি
দ্বীনের পথে এসো।
দ্বীনের পথে চলতে হলে
আসবে অনেক বাধা,
সকল বাধা পেরিয়ে তোমায়
ধরতে হবে কালেমার ঝাণ্ডা।
জীবন গড়ো আলীর মতো
আবূ তালেবের মতো নয়কো,
তবেই হবে তোমার জীবন
খাঁটি সোনার মতো।

হয়ে গেছে পেশা

-শামসুল আরেফীন
শ্রীপুর, গাজীপুর।

মারামারি খুনখারাবি হয়ে গেছে পেশা,
রাহাজানি চুরি করা হয়ে গেছে নেশা।
মানবতা ধামাচাপা বিবেক যেন অন্ধ,
জাহেলী যুগের মতো করছে লোকে মন্দ।
ধর্মকর্ম ভুলে গিয়ে চলছি নিজের মতো,
বিপন্নতা ছেয়ে গেছে লেগে আছে যত।
প্রতিযোগী হচ্ছে মানুষ লোক ঠকানোর কাজে,
ভেতর দিয়ে মন্দ করে সামনে ভালো সাজে।

আওয়াজ তুলো সবে

-সাদিয়া আফরোজ
শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

কত আছিয়া এভাবে
অকালে দিবে প্রাণ?
অপরাধীরা অপরাধ করে
গাইবে রে স্বাধীন গান!
নরপশুর থাবায় এবার
আগুন দিতে হবে,
জনসম্মুখে প্রস্তরাঘাত
আওয়াজ তুলো সবে।
ফুল হয়ে ফুটার আগে
কলিতেই ঝরল প্রাণ,
আছিয়ার ঐ আর্তনাদে
দিবে তো জাতি কান?
বাঙালিরা এখন তো আর
মুখ বুজে থাকে না,
তবুও কেন নরপশুদের
চোখ শাস্তি দেখছে না?
ভবিষ্যতে কোনো শিশু
অকালে না মরে,
এমন নির্যাতন যেন আর
শিশুকে না মারে।

বাংলাদেশ সংবাদ

হিজাব ও নিকাব পরা ছাত্রীদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সিদ্ধান্ত

নিকাব ও হিজাব পরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পরিচয় শনাক্তকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গোপনীয়তা বিবেচনায় রেখে নারী শিক্ষক, নারী কর্মকর্তা ও নারী কর্মচারীদের মাধ্যমে এটি করা হবে। গত ৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার উপাচার্যের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত ডিনস কমিটির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্রীদের পরিচয় শনাক্তকরণের জন্য প্রয়োজনে নারী সহকারী প্রক্টরের সহযোগিতা নেওয়া হবে। পরিচয় শনাক্তকরণের জন্য বায়োমেট্রিক সিস্টেম চালুর সম্ভাব্যতার বিষয়টি যথাসময়ে যাচাই করা হবে বলেও জানানো হয়। ঐদিন দুপুরে বাংলা বিভাগের ২০২২-২৩ সেশনের শিক্ষার্থী তাহমিনা আক্তার তামান্না বিভাগের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার পর হিজাব-নিকাব নিয়ে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন। এ নিয়ে সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতিতে সংবাদ সম্মেলনও করেন। সংবাদ সম্মেলনে তাহমিনা বলেন, আজ পরীক্ষা দেওয়ার সময় কর্তব্যরত শিক্ষক তাকে হাজিরা খাতায় সই করতে দেন এবং তার খাতাটা স্বাক্ষর করতে হাতে নেন। তখন ওই শিক্ষক তাকে মুখ দেখাতে বলেন। তিনি রাজি না হওয়ায় শিক্ষক চলে যান এবং একটু পরে একজন শিক্ষিকা এসে তার স্বাক্ষর নেন। তাহমিনা মনে করেন, অনেকেই এমন সমস্যার মুখোমুখি হন। এর সমাধান প্রয়োজন। তাই তিনি এ নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেন। এই পোস্টের দুই ঘণ্টা পর বিভাগের চেয়ারম্যান তাঁকে ফোন করে বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দেন। এই শিক্ষার্থী সংবাদ সম্মেলনে কয়েকটি দাবি জানান। এগুলো হলো অনতিবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের চেহারা দেখে শনাক্ত না করে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করতে হবে। বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু করার পূর্ব পর্যন্ত নারী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ও ভাইভায় নারী শিক্ষিকার মাধ্যমে শনাক্ত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এর আগে যেসব নারী শিক্ষার্থীকে নিপীড়ন ও হেনস্তা করা হয়েছে, সেসব ঘটনার যথাযথ তদন্ত করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রথম ধাপে ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নেবে মায়ানমার

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ৮ লাখ রোহিঙ্গার তালিকা থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য 'যোগ্য' হিসেবে চিহ্নিত করার কথা জানিয়েছে মায়ানমার। গত ৪ঠা এপ্রিল, রোজ শুক্রবার ব্যাঙ্ককে বিমস্টেকের ৬ষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. খলিলুর রহমানকে জানিয়েছেন মায়ানমারের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউ থান শিউ। প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর জানিয়েছে, বাংলাদেশ ২০১৮ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ছয়টি ধাপে ওই ৮ লাখ রোহিঙ্গার তালিকা মায়ানমারকে দিয়েছিল। তার মধ্যে প্রাথমিকভাবে ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চিহ্নিত করেছে মায়ানমার। আরও ৭০,০০০ রোহিঙ্গার চূড়ান্ত যাচাইকরণের জন্য তাদের ছবি এবং নাম যাচাই-বাছাই করা বাকি রয়েছে। মায়ানমারের কর্তৃপক্ষ আরও নিশ্চিত করেছে, মূল তালিকায় থাকা বাকি ৫,৫০,০০০ রোহিঙ্গার যাচাই দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে এবারই প্রথম নিশ্চিত কোনো তালিকা দিয়েছে মায়ানমার। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই ও স্বেচ্ছামূলক সমাধানের জন্য আহ্বান জানিয়ে আসছে। বাংলাদেশের কক্সবাজার ও ভাসানচরে বর্তমানে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী অবস্থান করছে, যাদের অধিকাংশই ২০১৭ সালে মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সেনাবাহিনীর নিপীড়নের শিকার হয়ে পালিয়ে আসে। মায়ানমার কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশ বারবার বলেছে, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও স্বেচ্ছামূলক প্রত্যাবাসনের জন্য রাখাইনে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করাটা জরুরী। এছাড়া, রোহিঙ্গা শরণার্থীরা নিজ দেশে ফেরত যেতে ইচ্ছুক হলেও তারা

নিরাপত্তা, নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের নিশ্চয়তা দাবি করে আসছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

লোকসভায় বিরোধীদের আপত্তির মধ্যেই মধ্যরাতে পাস বিতর্কিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল

ভারতের বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ২রা এপ্রিল, রোজ বুধবার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে লোকসভায় বুধবার মধ্যরাতে পাস হয়েছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল। ৩রা এপ্রিল, রোজ বৃহস্পতিবার এটি পেশ করা হয় রাজ্যসভায়। বুধবার লোকসভায় বিতর্কিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে বিতর্ক হয়েছে ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে। শেষ পর্যন্ত রাত ২টায় ভোটাভুটিতে ২৮৮-২৩২ ভোটে বিলটি পাস হয়েছে। লোকসভায় বিজেপির ২৪০ জন সাংসদ ছাড়াও এনডিএ শরিক জোটের সবাই সরকারের সমর্থনে ভোট দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে বিরোধীরা এককাট্টা গয়ে বিলের বিরোধিতায় ভোট দিয়েছে। বুধবার বিলটি লোকসভায় পেশ করেন ভারতের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বিলটি নিয়ে বিতর্কে বিরোধীরা সরাসরি এটিকে অসাংবিধানিক ও মুসলিমদের ধর্মে সরাসরি হস্তক্ষেপ বলে অভিযোগ করেন। একটা সময় ওয়াকফ বিলের কপি ছিঁড়ে ফেলেন এআইএমআইএম-এর সাংসদ আসাদউদ্দীন ওয়াইসি। তিনি দাবি করেন, এই বিল অসাংবিধানিক। সরকার যে আইন তৈরি করছে তাতে সংবিধানের ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন করা হয়েছে। এদিকে, সংসদে পাল্টা বক্তব্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, আমি স্পষ্ট করে দিচ্ছি, মুসলিমদের ধর্মকর্ম, তাদের যে দানের ট্রাস্ট, তাতে সরকার কোনো দখলদারি চায় না। ওয়াকফ আপনাদেরই থাকবে। বিলের সমালোচনা যারা করছেন, তাদের নিশানা করে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, যখন আমরা কোনো ইতিবাচক সংস্কার আনছি, তখন কেন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে? আলোচনা এবং সকলের মতামত নেওয়ার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসিকে ধন্যবাদ জানান রিজিজু। তিনি বলেন, ২৮৪টি প্রতিনিধিদল, ২৫টি রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ওয়াকফ বোর্ড এই বিষয়ে জেপিসির কাছে নিজেদের মতামত জানিয়েছে। ওয়াকফ সংশোধনী বিলে নারীর ক্ষমতায়নে লক্ষ্য রাখা হয়েছে বলে দাবি করে রিজিজু ওয়াকফ বোর্ডে মহিলা সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করার কথা ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রী ও সন্তানদের বঞ্চিত করে ওয়াকফ সম্পত্তি তৈরি করতে পারবেন না বলে স্পষ্ট করেছেন তিনি। বর্তমান ওয়াকফ আইনের ৪০ নম্বর ধারা অনুযায়ী, যেকোনো সম্পত্তিকে ওয়াকফ হিসাবে ঘোষণার অধিকার এত দিন ছিল ওয়াকফ বোর্ডের হাতেই। ফলে ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে বারবার বহু গরীব মুসলিমের সম্পত্তি, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ব্যক্তির সম্পত্তি অধিগ্রহণের অভিযোগ উঠেছে। নতুন সংশোধনীতে ওয়াকফ বোর্ডের সেই একচ্ছত্র অধিকার কেড়ে নিয়ে কোনো সম্পত্তি ওয়াকফ কি না, সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে জেলাশাসক বা সমপদমর্যাদার কোনো কর্মকর্তার হাতে। সরকারের যুক্তি, বর্তমানে যে আইন রয়েছে, তাতে ওয়াকফের দখল করা জমি বা সম্পত্তিতে কোনোভাবেই পর্যালোচনা করার সুযোগ থাকে না। কারও আপত্তি সত্ত্বেও জমি বা সম্পত্তি দখল করতে পারে ওয়াকফ বোর্ড। তাতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকে না সরকারের। নতুন বিলে তার বন্দোবস্ত রয়েছে। বিরোধী সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব অভিযোগ করেন, মেরুকরণের উদ্দেশ্যেই সংশোধিত ওয়াকফ বিল এনেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। এর পাশাপাশি আপত্তি উঠেছে নতুন বিলে ওয়াকফ বোর্ডে দুই অমুসলিম সদস্যের অন্তর্ভুক্তির বন্দোবস্ত নিয়েও। এ ছাড়া রয়েছে, একটি কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে ওয়াকফ সম্পত্তির নথিভুক্তিকরণ নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ১৯৫৪ সালে প্রথম ওয়াকফ আইন পাস হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে ওয়াকফ আইনে সংশোধনী এনে ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছিল। তারপর থেকেই বিজেপির তরফে বারবার প্রশ্ন তোলা হয়েছে বোর্ডের একচ্ছত্র অধিকার নিয়ে। বিজেপির দাবি, ওয়াকফ সম্পত্তির সমস্ত সুবিধা ভোগ করছে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী। বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ মুসলিমরা। নতুন আইন কার্যকর হলে সাধারণ মুসলিমরা উপকৃত হবেন।

মুসলিম বিশ্ব

গাযার অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ করছে ইসরাঈল, সংকুচিত ভূমিতে আটকে পড়েছে ফিলিস্তীনিরা

ফিলিস্তীনের গাযায় মার্চে যুদ্ধবিরতি ভেঙে দীর্ঘদিনের গণহত্যার যুদ্ধ পুনরায় শুরুর পর থেকে ক্রমশ গাযার নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে দখলদার ইসরাঈল। গত ৭ এপ্রিল, সোমবার লাইভ প্রতিবেদনে তুর্কিভিত্তিক গণমাধ্যম টিআরটি জানিয়েছে, দখলদার বাহিনী এখন গাযার ৫০ শতাংশেরও বেশি ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করছে। এর সঙ্গে ক্রমশ সংকুচিত জমির টুকরোয় আটকে পড়ছে ফিলিস্তীনিরা। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর মতে, ইসরাঈলি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকা বৃহত্তম এলাকা থেকে ফিলিস্তীনিদের বাড়িঘর, কৃষিজমি এবং অবকাঠামো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। জায়গাগুলো বসবাসের অযোগ্য করে তোলা হয়েছে। পৃথক প্রতিবেদনে টিআরটি জানিয়েছে, আজ গাযার মধ্যাঞ্চল থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদের নির্দেশ জারি করছে ইসরাঈল। ইসরাঈলি বাহিনী মধ্য গাযার ফিলিস্তীনিদের পালাতে বাধ্য করে চলেছে। সেই সঙ্গে দেইর আল-বালাহ শহর থেকেও নতুন করে সরিয়ে নেওয়ার আদেশ জারি করা হয়েছে। ইসরাঈলি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র আভিচায় আদরাই তার এক্স-পোস্টে দেইর আল বালাহের পাঁচটি এলাকা থেকে ফিলিস্তীনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করার একটি মানচিত্রও শেয়ার করেছেন।

২০ দিনে গাযায় নিহত ১৩৫০, নিভল ৪৯০ শিশুর জীবন

গাযা উপত্যকায় গত ২০ দিনে ইসরাঈলি বাহিনীর হাতে মোট ১ হাজার ৩৫০ জন ফিলিস্তীনি নিহত হয়েছেন যাদের মধ্যে ৪৯০ জনই শিশু। গত ৬ এপ্রিল, রোববার এক বিবৃতিতে গাযার সরকারি গণমাধ্যম দপ্তর এ তথ্য জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, এটি আধুনিক যুগের অন্যতম নৃশংস মানবতাবিরোধী অপরাধ। যেখানে ইসরাঈল গাযায় নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষ, বিশেষত শিশুদের টার্গেট করে ভয়াবহ গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। এতে আরও বলা হয়েছে, গত ২০ দিনে ইসরাঈল শিশুদের বিরুদ্ধে যে বর্বরতা চালিয়েছে, তা এক ভয়াবহ গণহত্যা—এই সময়ের মধ্যে ৪৯০ শিশু শহীদ হয়েছে। এই সময়ে মোট শহীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩৫০ জনে। ইসরাঈল বারবার দাবি করে আসছে, বেসামরিক হতাহত 'অনিচ্ছাকৃত'। কিন্তু গাযার গণমাধ্যম দপ্তর বলছে, এসব পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে যে ইসরাঈল একটি পরিকল্পিত ও পদ্ধতিগতভাবে শিশুদের টার্গেট করছে—যা আন্তর্জাতিক আইনের সরাসরি লঙ্ঘন। গত সপ্তাহে ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাযায় হামলা আরও জোরদার করার ঘোষণা দেন। এমন এক সময় এই ঘোষণা দেন যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্যোগে ফিলিস্তীনিদের গাযা থেকে উচ্ছেদ করে অন্যত্র স্থানান্তরের পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। গত ২০ দিনে ইসরাঈল শিশুদের বিরুদ্ধে যে বর্বরতা চালিয়েছে, তা এক ভয়াবহ গণহত্যা—এই সময়ের মধ্যে ৪৯০ শিশু শহীদ হয়েছে। এই সময়ে মোট শহীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩৫০ জনে। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ইসরাঈলি আগ্রাসনে গাযায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৫০ হাজার ৭০০ ফিলিস্তীনি নিহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। ইতোমধ্যে গাযায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) গত নভেম্বরে নেতানিয়াহু ও তার সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োয়াভ গালান্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। এছাড়া, গাযায় ইসরাঈলের যুদ্ধের কারণে দেশটির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) গণহত্যার মামলাও চলছে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

চালের চেয়েও ছোট তারহীন পেসমেকার বানালেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা

বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম পেসমেকার তৈরি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা। তারা জানিয়েছেন, চালের দানার চেয়েও ছোট এবং তারহীন এই নতুন পেসমেকার। এটি মাত্র এক মিলিমিটার পুরু এবং ৩.৫ মিলিমিটার লম্বা। এই অস্থায়ী হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রকটি সিরিঞ্জের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোনো অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই। পেসমেকারটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে প্রয়োজন না হলে শরীরেই দ্রবীভূত হয়ে যেতে পারে। ফলে

পেসমেকার বের করার জন্য রোগীকে আবার অস্ত্রোপচারের মুখোমুখি হতে হবে না। বাজারে বর্তমানে যেসব পেসমেকার প্রচলিত, সেগুলো হৃৎপিণ্ডে প্রতিস্থাপনের জন্য অস্ত্রোপচার বা সার্জারি প্রয়োজন হয়। কোনো কারণে যদি পেসমেকারের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তাহলে শরীর থেকে বের করার জন্যও অস্ত্রোপচার বা সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মানুষের ওপর পরীক্ষা করার এখনও কয়েক বছর বাকি থাকলেও, ওয়্যারলেস বা তারহীন নতুন এই পেসমেকার একটি 'রূপান্তরকারী অগ্রগতি' হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে। এই আবিষ্কার চিকিৎসার অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য উৎসাহিত করতে পারে। বর্তমানে অস্থায়ী পেসমেকার অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বসানো হয় এবং রোগীর বুকে একটি ডিভাইসের সঙ্গে তার সংযুক্ত থাকে। যখন পেসমেকার আর প্রয়োজন হয় না, তখন ডাক্তার বা নার্সরা তারগুলো টেনে বের করে দেয়, যা কখনও কখনও ক্ষতির কারণ হতে পারে। ২০১২ সালে চাঁদে হেঁটে আসা প্রথম ব্যক্তি নীল আর্মস্ট্রংয়ের অস্থায়ী পেসমেকার অপসারণের পর অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের কারণে তিনি মারা যান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র গবেষণা লেখক জন রজার্স এএফপিকে বলেছেন, 'আমাদের আশা, এটি চিকিৎসাক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে'। গবেষণা অনুসারে, এখন পর্যন্ত, ল্যাবে ইঁদুর, শূকর, কুকুর এবং মানুষের হৃৎপিণ্ডের টিস্যুর ওপর চালানো পরীক্ষায় নতুন পেসমেকারটি কার্যকরভাবে কাজ করেছে। রজার্স ধারণা করছেন পেসমেকারটি দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে মানুষের ওপর পরীক্ষা করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার ল্যাব একটি স্টার্ট-আপ চালু করেছে।

দাওয়াহ সংবাদ

কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা কোর্স : ব্যাচ নং- ০৬

দ্বীন শিখতে আগ্রহী জেনারেল শিক্ষিত ভাইদের জন্য বিদগ্ধ শায়খদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে থেকে দ্বীন শিক্ষার এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে 'আদ-দাওয়া ইলাল্লহ'। গত প্রথম রামাযান হতে ২০তম রামাযান পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে আগত জ্ঞানপিপাসু দ্বীনি ভাইয়েরা 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহীতে একত্রিত হয়ে একটানা '২০ দিন মেয়াদী' মদীনা ও বাংলাদেশের বিদগ্ধ উলামায়ে দ্বীনের সান্নিধ্যে থেকে হাতে-কলমে সঠিক দ্বীনের জ্ঞান, আক্বীদা-আমল, আদব-তারবিয়াত শিখেন। শব-গুজারীর মাধ্যমে ইবাদতে অভ্যস্ত হন। নির্দিষ্ট সিলেবাস ও রুটিন মাফিক কোর্সটি বিনামূল্যে তারা গ্রহণ করেন। কোর্সে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে ৬৩ জন দ্বীনী ভাই অংশগ্রহণ করেন।

'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর অধীন পরিচালিত 'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ' এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর সহ-সেক্রেটারি ও 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ'-এর সম্মানিত পরিচালক-২ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক। এতে প্রশিক্ষক ছিলেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর শিক্ষক ও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর দাঈগণ— আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাহবুবুর রহমান মাদানী, আব্দুল আহাদ, হাসান আল-বান্নাহ মাদানী, আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। উক্ত কোর্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ ছিলে ছালাতের প্র্যাক্টিকাল প্রশিক্ষণ যা মাহবুবুর রহমান মাদানী প্রদান করেন। যা প্রশিক্ষণার্থীরা অতীব স্বাচ্ছন্দ্যে উপভোগ করেন এবং ছালাত শিক্ষায় অনেক উপকৃত হন। কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাদের মাঝে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করা হয়। প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে পুরস্কার এবং যথাক্রমে সকল প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে কোর্সটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে স্বয়ং আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক উপস্থিত ছিলেন।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): নবী ও রাসূলগণের সাথে কিরামান কাতেবীন (সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণ) থাকে কি এবং তাদের কোনো আমলনামা আছে কি? দলীলসহ উত্তর চাই।

-আ. জাব্বার
পঞ্চগড়।

উত্তর: নবী ও রাসূলগণের সাথে সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণ ছিলেন এবং তাদেরও আমলনামা ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যখন দুজন গ্রহণকারী ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে আমল গ্রহণ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) সদা প্রস্তত প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে’ (ক্বাফ, ৫০/১৭-১৮)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেহেতু মানুষ ছিলেন, সুতরাং তাদের সাথে লেখকগণ ছিলেন এবং তাদের আমলনামা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহ তাআলার নিকটে) আমল পেশ করা হয়। সুতরাং আমি চাই আমার আমলসমূহ যেন ছিয়াম পালনরত অবস্থায় পেশ করা হয়’ (তিরমিযী, হা/৭৪৭)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, নবীদের আমলনামা লেখা হতো।

প্রশ্ন (২): কেউ যদি জেনেশুনে বারবার কাবীরা গুনাহ করে, তাহলে কি সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে?

-জান্নাতুল ফেরদাউস
ঢাকা।

উত্তর: কাবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি তওবা করলে তার পাপ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন’ (আন-নিসা, ৪/৪৮)। কিন্তু কাবীরা গুনাহ করে ক্ষমা চাওয়ার আগেই যদি সে ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে সে আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে থাকবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাত দিতে পারেন, আবার তার অপরাধের কারণে শাস্তিও দিতে পারেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আর যদি কেউ এমন কিছু করে আর আল্লাহ তা গোপন রাখেন, তবে এটা তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন, ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন’ (ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৮৪)। উল্লেখ্য, বারবার গুনাহের পরও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭৫০৭)।

প্রশ্ন (৩): আমি একটা খারাপ কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্য ওয়াদা করি এবং বলি, ‘আমি যদি এই কাজ পরবর্তীতে করি, তাহলে আমি কাফের হয়ে যাব’। বেশ কিছুদিন দূরে থাকতে পারলেও আমি সেই কাজটি আবার করে ফেলি। এ মুহূর্তে আমার করণীয় কী? আমি কি কাফের হয়ে যাব?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: ‘আমি যদি এই কাজ পরবর্তীতে করি, তাহলে আমি কাফের হয়ে যাব’ এমন কথা বলার দ্বারা সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে না। কেননা সে ব্যক্তি যে বিষয়ে কথাটি বলেছিল সেটিকে ঘৃণা প্রকাশের জন্যই বলেছিল। মূলত সে মুরতাদ হয়ে যাবে এজন্য বলেনি। তাই যদি কেউ কুফরীর শপথ করে বলে, যদি সে এমন কিছু করে, তবে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে মুক্ত অথবা সে একজন ইয়াহূদী বা খ্রিষ্টান হয়ে যাবে; তবে সে শপথের কারণে কাফের হবে না, যদিও এটি একটি শর্তাধীন ঘোষণা। কেননা তার শপথের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কাজটি অপছন্দ করা ও তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, কুফরী ইচ্ছা নয় (মাজমূউল ফাতাওয়া লি-ইবনে তায়মিয়্যাহ, ৩২/৯১)। এমন কথা শপথ হিসেবে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে তাকে কাফফারা দিতে হবে (আশ-শারহুল মুমতে, ১৫/১৫৫)।

প্রশ্ন (৪): শিশুর কপালে টিপ দেওয়া যাবে কি? এটা কি শিরক?

-আব্দুর রহমান
মিরপুর-১, ঢাকা।

উত্তর: সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস হলো, বদনজর থেকে বা কুদৃষ্টি থেকে বাচ্চাকে রক্ষার জন্য ছোট বাচ্চাদের কপালের একপাশে আঙুল দিয়ে কালো টিপ এঁকে দেওয়া হয়। এই বিশ্বাস থেকে কপালে টিপ দেওয়া যাবে না। এটি একটি সামাজিক কুসংস্কার। এই বিশ্বাসে টিপ দিলে তা শিরক হবে। বরং বদনজর থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত দু‘আটি বলতে হবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাসান এবং হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা-এর জন্য নিম্নোক্ত দু‘আ পড়ে পানাহ চাইতেন আর বলতেন, ‘তোমাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইসমাঈল ও ইসহাক আলাইহিমাস সালাম-এর জন্য এ দু‘আ পড়ে পানাহ চাইতেন, أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ অর্থাৎ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৭১)। তবে সৌন্দর্যের জন্য দেওয়া যায়।

প্রশ্ন (৫): উযাইর আলাইহিস সালাম কে ছিলেন? তিনি কি আল্লাহর নবী ছিলেন? উযাইর নামে ছেলেদের নাম রাখা যাবে কি না?

-রবিউল ইসলাম
মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর: এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে উযাইর আলাইহিস সালাম একজন সৎ লোক ছিলেন। যদিও প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তিনি বনী ইসরাঈলের একজন নবী ছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২/৩৮৯)। এব্যাপারে হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি অবহিত নই যে, তুব্বা অভিশপ্ত কি না এবং আমার জানা নেই যে, উযাইর নবী কি না' (আবূ দাঊদ, হা/৪৬৭৪)। একথা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার অবস্থা জানার আগে বলেছেন। কিন্তু উযাইর এর ব্যাপারে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি নবী ছিলেন (শারহু সুনান আবী দাঊদ, ১৭/৫২৩)। আর উযাইর নামকরণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (৬): ঘুমের মাঝে বুকের উপর জিন ভর করে। যাকে আমরা বোবা জিন বলে থাকি। বোবা জিনের অস্তিত্ব ইসলামে আছে কি? যদি থাকে তাহলে এর চিকিৎসা কী?

-মইনুল ইসলাম
চট্টগ্রাম।

উত্তর: বোবা জিনে ধরা স্বপ্নের অন্তর্ভুক্ত। স্বপ্ন ভালো খারাপ হতে পারে। খারাপ স্বপ্নেরই একটি দিক হলো বোবা জিনে ধরা। সুতরাং এমনটি হলে বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে, শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় চাইবে, তার পার্শ্ব পরিবর্তন করবে এবং উঠে দুই রাকআত ছালাত আদায় করবে (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৬১-২২৬২)।

প্রশ্ন (৭): শিরকের গুনাহ মাফ হয় না। এখন কেউ মারা যাওয়ার পরে যদি তার ছেলেমেয়েরা তার জন্য আল্লাহর কাছে তার শিরকের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়, তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে কি?

-জসিম
রাজশাহী।

উত্তর: শিরক করা অবস্থায় মারা গেলে তার পাপ ক্ষমা হবে না, এ কথায় ঠিক এবং তাদের ব্যাপারে ক্ষমা চাওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য সংগত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে; যদিও তারা আত্মীয়-স্বজন হয়' (আত-তাওবা, ৯/১১৩)। তবে শিরকের বিভিন্ন ধরন আছে। এমন লোক যদি সাধারণ শিরক করে মারা যায়; কবরপূজার মতো বড় শিরক না করে, তাহলে তার পক্ষ থেকে দান করলে ও ক্ষমা চাইলে ক্ষমা হতে পারে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে এসে বলল, আমার পিতা অছিয়ত না করেই অনেক সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব, আমি যদি এখন তার পক্ষ হতে দান করি; তাহলে কি তার উপকার হবে? তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩০; নাসাঈ, হা/৩৬৫২; ইবনু মাজাহ, হা/২৮২০)। তবে তাদের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়া হবে না। এছাড়া রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কবরের পাশে গিয়ে হাত তুলে দু'আ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭৪)।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৮): ওযূর শুরুতে ও শেষে পঠিতব্য দু'আসমূহ জানিয়ে বাধিত করবেন। এগুলো পড়ার বিধান কী?

-সাকিব আহমাদ
বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর: ওযূ শুরু করতে হবে বিসমিল্লাহ বলে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি ওযূর সময় বিসমিল্লাহ বলে না, তার ওযূ নেই' (তিরমিযী, হা/২৫)। আর ওযূর শেষে বলবে, أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি উত্তম ও পূর্ণরূপে ওযূ করে এ দু'আ পড়বে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে (ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৪)। এছাড়া এ দু'আও বলতে পারে سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৬০২৩; মাওকূফ ছহীহ)। তাছাড়া এ দু'আও বলতে পারে اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (তিরমিযী, হা/৫৫; ইরওয়াউল গালীল, ১/১৩৫)। ওযূর পর উক্ত দু'আগুলো পড়া সুন্নাত।

প্রশ্ন (৯): অযূর সময় মুখে ও নাকে একসাথে পানি দিব নাকি পৃথকভাবে পানি দিব? মুখে ও নাকে একসাথে পানি দিলে আগে মুখে দিব না আগে নাকে দিব?

-মোহা. আব্দুল্লাহ আল-আমিন
মনাকষা, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কাজটি এক অঞ্জলি পানি দিয়ে একসাথে করাই উত্তম। কেননা তা বহু সংখ্যক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ছহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক খাবল (অঞ্জলি) পানি দিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৯১)। এক্ষেত্রে আগে কুলি করবে, তারপর নাকে পানি দিবে। তবে ভিন্ন ভিন্ন পানি দিয়ে আলাদাভাবেও করা যায়। আবূ হাইআ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -কে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি উভয় হাতের কজি পর্যন্ত ধৌত করলেন এবং ভালোভাবে পরিষ্কার করলেন, তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন, তিনবার করে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন, একবার মাথা মাসাহ করলেন এবং উভয় পা গোছা পর্যন্ত ধৌত করলেন (তিরমিযী, হা/৪৮)।

প্রশ্ন (১০): আমি শুনেছি যে, বিচার দিবসে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওযূর চিহ্ন দেখে আমাদের চিনতে পারবেন। ওযূ কি শুধু আমাদের জন্যই খাছ নাকি আগেও ছিল? আর যদি তাই হয়, তাহলে

অন্য সকল উম্মাহরা কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: ওযূর ফযীলত হিসেবে ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো আলোকিত হওয়ার বিষয়টি শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য খাছ, যা দেখে তিনি তাঁর উম্মতকে চিনবেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৬)। তবে ওযূ, ছালাত, ছিয়াম, যাকাতের বিধান আগেও উম্মতের মাঝেও ছিল। যেমন- ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন ছালাত ও যাকাত আদায় করতে (মারইয়াম, ১৯/৩১)। ছিয়ামের বিধান ছিল (আল-বাকারা, ২/১৮৩)। জুরাইজের ঘটনায় এসেছে, তিনি ওযূ করলেন ও ছালাত আদায় করলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৩৬)। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রী সারা দাঁড়িয়ে ওযূ করলেন ও ছালাত আদায় করলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৫০)। হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, ওযূর বিধান পূর্বেও ছিল।

প্রশ্ন (১১): পেশাব করে কুলুখ ধরে উঠে যাওয়ার পরও দুই-তিন ফোটা পেশাব পড়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে করণীয় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: পেশাব-পায়খানার পর পানি দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করতে হবে; ঢিলা-কুলুখ নয়। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যেতেন আমি এবং অন্য এক বালক পানির পাত্র ও বর্শা নিয়ে যেতাম। সে পানি দিয়ে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্রতা অর্জন করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৫২)। এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বেশির ভাগ কবরে আযাব পেশাব থেকে অসতর্কতার কারণেই হয়ে থাকে' (ইবনে মাজাহ, হা/৩৪৮)। যদি পেশাবের ফোটা পড়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হন, তাহলে পেশাব লাগার স্থানটি ধুয়ে ফেলে প্রত্যেক ছালাতের জন্য ওযূ করা আবশ্যক (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৫)। আর ওযূর পর সন্দেহ হলে পানি ছিটিয়ে দিবে। বানূ ছাক্বীফের এক ব্যক্তি হতে এবং তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পেশাব করার পর তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ছিটাতে দেখেছি (আবূ দাঊদ, হা/১৬৭)।

ছালাত

প্রশ্ন (১২): তিন রাকআত বিশিষ্ট বিতর ছালাতের নির্দিষ্ট সূরা আছে কি? বিতর এর পরে কোনো দু'আ থাকলে জানাবেন।

-ফিরোজ কবির
নওঁগা।

উত্তর: বিতর ছালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সূরা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কুরআনের যতটুকু পড়া তোমার জন্য সহজ হয়, তুমি ততটুকু পড়ো' (মুযযাম্মিল,৭৩/২০)। তবে বিতরের প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরুন, তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাছ পড়া সুন্নাত। আলী ইবনু হুজর রহিমাহুল্লাহ .... ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর ছালাতের এক-এক রাকআতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى - قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ - قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ পাঠ করতেন (তিরমিযী, হা/৪৬২)। তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাছের পরে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়া যায় (তিরমিযী, হা/৪৬৩)। আর বিতরের পরের দু'আর ব্যাপারে হাদীছে এসেছে, উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর ছালাতের সালাম ফিরিয়ে বলতেন, 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' (আবূ দাঊদ, হা/১৪৩০)। মুসনাদে আহমাদে এসেছে, তিনবার বলতেন এবং তৃতীয়বারে আওয়াজ উঁচু করে বলতেন (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫৩৬১)।

প্রশ্ন (১৩): রাতে তাহাজ্জুদের ছালাত স্বামী-স্ত্রী একসাথে জামাআত করে পড়তে পারবে কি? আর আমি জানি যে, সম্মিলিতভাবে দু'আ করা বিদআত! কিন্তু দুইজনের চাওয়া-পাওয়া যদি একই হয়, তাহলে তাহাজ্জুদের ছালাত শেষে দুইজনে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করতে পারবে কি?

-মো. তাহেনুর রহমান
নয়নপুর, সদর, দিনাজপুর।

উত্তর: রাতের তাহাজ্জুদ ছালাতসহ যেকোনো নফল ছালাত স্ত্রী বা পরিবারের সাথে জামাআতের সাথে আদায় করা যাবে। সেক্ষেত্রে মহিলারা পিছনে দাঁড়াবে। আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমাদের ঘরে আমি ও এক ইয়াতীম ছেলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলাম। আর আমার মা উম্মু সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহা আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৭)। এখানে দু'আ করলে সবাই একা একা দু'আ করবে; সম্মিলিতভাবে নয়।

প্রশ্ন (১৪): ভুলক্রমে সতরের কিছু অংশ খোলা রেখে ছালাত আদায় করলে করণীয় কী?

-মো. রাহুল
টাঙ্গাইল।

উত্তর: পুরুষ-মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই ছালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো সতর ঢেকে রাখা। কোনো ব্যক্তি যদি সতর ঢেকে ছালাত আদায় করে এবং ছালাতের মাঝে অনিচ্ছাকৃতভাবে বা অজ্ঞাতবশত সতর খুলে যায়, তাহলে ছালাত বাতিল হবে না। যদিও লম্বা খুলে থাকে (কাশফুল কেনা, ২/১৩৫)। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো' (আত-তাগাবুন, ৬৪/১৬)। আমর বিন আবূ সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার পরনে ছিল শুধু একটি চাদর। আমি

যখন সাজদায় যেতাম, তখন চাদরটি আমার শরীর হতে সরে যেত। আমাদের জাতির একজন মহিলা (এ অবস্থা দেখে) বলল, আমাদের সামনে হতে তোমরা তোমাদের ইমামের লজ্জাস্থান ঢেকে দিচ্ছ না কেন? জাতির লোকেরা যখন কাপড় খরিদ করল এবং আমার জন্য জামা বানিয়ে দিল, এ জামার জন্য আমার মন এমন খুশি হলো যা আর কখনো হয়নি (ছহীহ বুখারী, হা/৪০৫১)।

প্রশ্ন (১৫): জুমআর দিনে মসজিদে পায়ে হেঁটে যাওয়া সুন্নাত এবং এর বিশেষ ফযীলত রয়েছে। কিন্তু জেলা পর্যায়ে আহলেহাদীছ মসজিদের সংখ্যা কম হওয়ায় বাড়ি থেকে দূরত্ব অনেক বেশি হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই মসজিদগুলোতে জুমআর দিনে হেঁটে যাওয়া সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে জুমআর দিনে মসজিদে যাতায়াতে যানবাহন ব্যবহার করলে কি ফযীলত পাওয়া যাবে না?

-তাওহিদুল ইসলাম
কাঠালতলা, যশোর।

উত্তর: জুমআয় হেঁটে যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ ফযীলতের কথা এসেছে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুমআর দিন নিজে গোসল করবে এবং (স্ত্রীকেও) গোসল করাবে, সকাল সকাল মসজিদে যাবে, পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে, বাহনে চড়ে নয় এবং কোনোরূপ অনর্থক কথা না বলে ইমামের নিকটে বসে খুৎবা শুনবে, তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে সে এক বছর ছিয়াম পালন ও রাতভর ছালাত আদায়ের (সমান) ছওয়াব পাবে' (আবূ দাঊদ, হা/৩৪৫)। অত্র হাদীছের উপর আমল করার ইচ্ছায় পায়ে হেঁটে জুমআয় যাওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। পায়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব না হলে সদিচ্ছার কারণে নেকী পাবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন বান্দা পীড়িত হয় কিংবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য তা-ই লেখা হয়, যা সে আবাসে সুস্থ অবস্থায় আমল করত' (ছহীহ বুখারী, হা/২৯৯৬)।

প্রশ্ন (১৬): মহিলাদের শাড়ি পরে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-সাদ্দাম
কুমিল্লা।

উত্তর: শাড়ি পরে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে (ছহীহ বুখারী, হা/৩৬১; ছহীহ মুসলিম, হা/৩০১০)। উল্লেখ্য, শাড়ি পরার মাধ্যমে যমিন থেকে পর্দা করা যায় না বা যমিনের সাথে লজ্জাস্থানের সম্পর্ক তৈরি হয়, এসব ভিত্তিহীন অশ্লীল কথা, যার সাথে শরীআতের কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন (১৭): 'রব্বী ইন্নী লিমা আনযালতা ইলাইয়্যা মিন খায়রিন ফাকির' এই দু'আটি ফরয, সুন্নাত, নফল যে কোনো ছালাতের সিজদাতে গিয়ে কি পড়া যাবে?

-মো. মুহিব সাবের
৩০০/১ রসুলপুর, দনিয়া, ঢাকা- ১২৩৬।

উত্তর: ছালাতের রুকূ ও সিজদায় কুরআন পাঠ করতে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাকে নিষেধ করা হয়েছে আমি যেন রুকূ বা সিজদারত অবস্থায় কুরআন পাঠ না করি। তোমরা রুকূ অবস্থায় মহান প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করবে এবং সিজদারত অবস্থায় অধিক দু'আ পড়ার চেষ্টা করবে, কেননা তোমাদের দু'আ কবুল হওয়ার উপযোগী' (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৯)। সুতরাং 'রব্বী ইন্নী লিমা আনযালতা...এটি কুরআনের আয়াত হওয়ায় সিজদায় পড়া যাবে না। কেননা তা দু'আ হিসেবে ব্যবহার হয়নি।

প্রশ্ন (১৮): ছালাতে থাকাবস্থায় যদি বায়ু নির্গত হয়, তাহলে করণীয় কী?

-হাসান মোল্লা
গোপালগঞ্জ।

উত্তর: ছালাতরত অবস্থায় বায়ু নির্গত হলে ওযূ ভেঙে যাবে। তখন ছালাত ছেড়ে দিয়ে ওযূ করে নতুনভাবে ছালাত আদায় করতে হবে। আলী ইবনু তালক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যখন কোনো ব্যক্তির ছালাতের মধ্যে বায়ু নির্গত হয়, তখন সে যেন পুনরায় ওযূ করে এবং ছালাত আদায় করে' (আবূ দাঊদ, হা/২০৫)।

প্রশ্ন (১৯): ইমাম যখন তাশাহহুদ শেষে সালাম ফিরায়, তখন আমি কি ইমামের দুই দিকে সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে যাব? নাকি ডানদিকে সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে বাকি রাকআত আদায় করব? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মদ সালমান রহমানী
জামালপুর।

উত্তর: ইমাম ডানদিকে সালাম শেষ করে বামদিকে সালাম আরম্ভ করলে মুক্তাদি উঠতে পারে অথবা দ্বিতীয় সালাম শেষ হলে উঠবে (মুগনী, ১/৩৬৯)। ইমামের প্রথম সালামের পর তার অনুসরণ করা শেষ হয়ে যায়। তবে ইমামের ছালাম ফিরানোর আগেই যদি মুক্তাদী দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে তার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে (আল-মাওসূআতুল ফিক্বহিয়্যাহ, ৩৭/১৬৩)।

প্রশ্ন (২০): আমার বাড়ির আশেপাশের প্রায় সব ইমামই ভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাস করে। যেমন- নবী নূরের তৈরি, পীর-মুরীদিতে বিশ্বাস করে ইত্যাদি। তাহলে আমি কোথায় ছালাত আদায় করব?

-আনাছ বিন লোকমান
উল্লাপাড়া।

উত্তর: প্রথমত, এমন ব্যক্তিকে নির্ধারিত ইমাম বানানো উচিত নয়; যার আক্বীদা সঠিক নয়। এমতাবস্থায় ছহীহ

আক্বীদার ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। সম্ভব না হলে প্রকাশ্যে মুসলিম এমন কোনো ব্যক্তি ইমামতি করলেই তার পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে; সে ফাসেক হলেও। কারণ ইমামের পাপ মুক্তাদীর উপর বর্তাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'কেউ কারো গুনাহের বোঝা বহন করবে না' (আল-আনআম, ৬/১৬৪)। হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তার পিছনেও ছালাত আদায় করে নিবে। তবে বিদআতের গুনাহ তার উপরই বর্তাবে (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৫)। তার ভুলের কারণে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কিন্তু অন্য মুছল্লীদের ছালাত হয়ে যাবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তারা তোমাদের ছালাত আদায় করায়। সুতরাং যদি তারা ঠিকভাবে ছালাত আদায় করায়, তাহলে তোমাদের ও তাদের ছওয়াব হবে আর যদি ভুল করে, তাহলে তোমাদের ছওয়াব হবে এবং এর দায় তাদের উপর বর্তাবে' (মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৬৪৮)।

প্রশ্ন (২১): এক লোক নিয়মিত সিগারেট খায় আবার পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, তার ছালাত কবুল হবে কি?

-ফিরোজ কবীর
নওগাঁ সদর।

উত্তর: এগুলো خبائث এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন (আল-আ'রাফ, ৭/১৫৭)। সিগারেট তৈরির মূল উপাদান হলো তামাক। আর নিঃসন্দেহে তামাক নেশাদার দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। আর কোনো বস্তুর মধ্যে মাদকতা বা নেশা থাকলে সেটা সুস্পষ্ট হারাম বলে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক নেশাদার দ্রব্যই হারাম' (ছহীহ বুখারী, হা/৬১২৪)। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে বস্তুর বেশি পরিমাণ নেশার সৃষ্টি করে, তার অল্প পরিমাণও হারাম' (তিরমিযী, হা/১৮৭১)। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি ধূমপান করে তাহলে ৪০ দিন তার ছালাত কবুল হবে না। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মদ পান করে এবং মাতাল হয়, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার ছালাত কবুল হয় না' (ইবনু মাজাহ, হা/৩৩৭৭; তিরমিযী, হা/১৮৬২)। এমতাবস্থায় ছালাত কবুল না হলেও সে ছালাত ছেড়ে দিতে পারবে না; তাকে সময়মতো ছালাত আদায় করতে হবে এবং ধূমপান পরিহারের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন (২২): আমাদের মসজিদে কোনো এক ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি অর্থাৎ ডিজিটাল ঘড়ি দান করেছে, যা অত্যন্ত চাকচিক্য এবং সকল সময় রঙিন আলো জলে। ঘড়িটি ইমামের ডান পাশে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, যা নিয়ে মুছল্লীদের দ্বিমত রয়েছে। ঘড়িটি ঐ স্থানে রাখা যাবে কি-না?

-রবিউল ইসলাম
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর: এমন রঙিন ও চাকচিক্য ঘড়ি মুছল্লীদের সামনে ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। কেননা এতে ছালাতের একাগ্রতা নষ্ট হয় আর মনোযোগ নষ্ট করে এমন কিছু মসজিদে রাখা যাবে না। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একটি কারুকার্য খচিত চাদর পরিধান করে ছালাত আদায় করছিলেন। ছালাতের মধ্যেই চাদরের কারুকার্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল। ছালাত শেষে তিনি বললেন, 'আমার এই চাদরটা আবূ জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং তার কাছ থেকে আমবিজানিয়্যাহ (কারুকার্য ছাড়া মোটা চাদর) নিয়ে এসো। এটা আমাকে ছালাত হতে অমনোযোগী করে দিচ্ছিল' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৩)। এছাড়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদকে চাকচিক্য করতে নিষেধ করেছেন (আবূ দাঊদ, হা/৪৪৯)। তাই উক্ত ঘড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে বা পিছনের দিকে রাখতে হবে।

যাকাত

প্রশ্ন (২৩): প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ গ্রহণ করা যাবে কি? এর যাকাত কি প্রতি বছর দিতে হবে?

-হালিমা খাতুন
মাধবপুর।

উত্তর: বাধ্যতামূলক বেতনের নির্ধারিত যে অংশ প্রতি মাসে কেটে নেওয়া হয়, চাকরি শেষে শুধু সেই অর্থই গ্রহণ করা যাবে। আর তা থেকে প্রাপ্ত সূদের অংশটি নেকীর উদ্দেশ্য ছাড়াই দান করে দিতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' (আল-বাকারা, ২/২৭৫)। আর যদি তা প্রতিবছর উঠানো সম্ভব হয় তাহলে সূদের টাকা ব্যতীত অবশিষ্ট টাকা অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে প্রতিবছর যাকাত দিতে হবে। আর সম্ভব না হলে টাকা উত্তোলনের সময় শুধু এক বছরের যাকাত আদায় করে দিবে। কেননা যাকাত দেওয়ার জন্য সম্পদের পূর্ণ মালিকানা থাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে বিধান চাপিয়ে দেন না' (আল-বাকারা, ২/২৮৬)।

হজ্জ

প্রশ্ন (২৪): প্রতি মাসে ব্যাংকে টাকা জমিয়ে জমিয়ে হজ্জ করার বিধান কী?

-মো. কানব হাসনাত
ঢাকা ১২০৭।

উত্তর: ব্যাংকে টাকা জমিয়ে হজ্জ করাকে আল্লাহ তাআলা ফরয করেননি। মানুষের স্বাভাবিক গতিতে যখন হজ্জ করার সামর্থ্য হবে তখন সে ব্যক্তি হজ্জ করবে। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ

করার উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকভাবে টাকা জমানোর কথা বলেননি। বরং যার শারীরিকভাবে এবং আর্থিকভাবে হজ্জ করার সামর্থ্য হবে তাকেই হজ্জ করতে হবে, একথা রাসূল ﷺ বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য' (আলে ইমরান, ৩/৯৭)।

জানাযা

প্রশ্ন (২৫): জানাযা কাঁধে নিয়ে ৪০ কদম হাঁটতে হবে। মাইয়্যেতের ডান হাতের দিকের খাটের পায়া নিজের ডান কাঁধে নিয়ে দশ কদম চলবে। এরপর ডান পায়ের দিকের খাটের পায়া ডান কাঁধে নিয়ে দশ কদম, তারপর বাম হাতের দিকের খাটের পায়া নিজের বাম কাঁধে নিয়ে দশ কদম, শেষে বাম পায়ের দিকের খাটের পায়া নিজের বাম কাঁধে রেখে দশ কদম। এ পদ্ধতি কি সঠিক?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: এমন কোনো পদ্ধতি কুরআন-হাদীছে বর্ণিত হয়নি। এটি একটি বানোয়াট প্রথা, যার কোনো ভিত্তি নেই। রাসূল ﷺ, ছাহাবীগণ ও তাবে-তাবেঈ থেকে তা প্রমাণিত নয়। এটি উজ্জ্বল শরীআতে স্পষ্ট বিদআত।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (২৬): কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো পোডাক্ট কাউকে নির্ধারিত মূল্যে ব্যবহার করতে দেয়। এসময় প্রতিষ্ঠানের কোনো তৃতীয় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে না জানিয়ে ব্যবহারকারীর নিকট থেকে অতিরিক্ত টাকা নিয়ে থাকে। এ টাকা নেওয়া কি জায়েয?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: মালিককে না জানিয়ে প্রতিষ্ঠানের কোনো জিনিস কাউকে ব্যবহার করতে দিয়ে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া বৈধ হবে না। আবূ হুমায়দ আস-সাঈদী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বানী আসাদ গোত্রের ইবনু লুতাবিয়্যা নামের এক লোককে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী বানালেন। সে যখন ফিরে এল, তখন বলল, এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। এ কথা শোনার পর নবী ﷺ মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন। সুফিয়ান কখনো বলেন, তিনি মিম্বরের উপর উঠলেন এবং আল্লাহর হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। এরপর বললেন, 'কর্মকর্তার কী হলো! আমি তাকে পাঠাই, তারপর সে ফিরে এসে বলল, এগুলো আপনার আর এগুলো আমার। সে তার বাপের বাড়ি কিংবা মায়ের বাড়িতে বসে থেকে দেখত যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কি-না? যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! যা কিছুই সে গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তা কাঁধে বয়ে নিয়ে হাজির হবে। যদি উট হয়, তাহলে তা চিৎকার করবে; যদি গাভী হয়, তাহলে তা হাম্বা হাম্বা করবে অথবা যদি বকরি হয়, তাহলে তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করবে (ছহীহ বুখারী, হা/৭১৭৪)। বুরায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'আমরা কাউকে সরকারি পদে নিযুক্ত করলে তার আহারের ব্যবস্থাও আমার দায়িত্ব। পরে সে অতিরিক্ত কিছু নিলে, তবে তা আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য হবে' (আবূ দাঊদ, হা/২৯৪৩)।

প্রশ্ন (২৭): সকল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ ও তার সাথে দরূদে ইবরাহীম পড়া যাবে কি?

-তুষার মোল্লা
গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।

উত্তর: সকল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে। রাসূল ﷺ কোনো কাজ করলে বিসমিল্লাহ বলতেন। যেমন- পশু যবেহ করা, স্ত্রী সহবাস করা, পেশাব-পায়খানায় প্রবেশ করা ইত্যাদি। বিভিন্ন হাদীছের দিকে লক্ষ্য রেখেই ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছেন, সর্বাবস্থায় বিসমিল্লাহ বলা এমনকি সহবাসের সময়েও (ছহীহ বুখারী, হা/১৪১)। আর সবকাজের শুরুতে নির্দিষ্টভাবে দরূদে ইবরাহীম পড়ার কোনো দলীল নেই। তবে যেকোনো সময় দরূদে ইবরাহীম পড়া যায়। রাসূল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার প্রতি দশটি রহমত বর্ষণ করবেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/৪০৮)।

প্রশ্ন (২৮): সেন্ট বা বডি স্প্রে ব্যবহারে ইসলামের বিধান কী? এগুলো কি ব্যবহার করা জায়েয?

-কাওসার জামান
শহীদ জিয়াউর রহমান হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর: ইসলামে অ্যালকোহল বা অন্যান্য নিষিদ্ধ পদার্থ যুক্ত সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয নয়। কেননা প্রত্যেক নেশাদার দ্রব্যই হারাম (ছহীহ বুখারী, হা/৬১২৪)। তবে অ্যালকোহলমুক্ত সুগন্ধি ব্যবহার করা বৈধ, যা আতর নামে পরিচিত। সুগন্ধি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুবই প্রিয় ছিল। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্য বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমার পৃথিবীর সুগন্ধি আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে' (সুনানে নাসাঈ, হা/৩৯৩৯)। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, (কেউ তাকে খুশবু হাদিয়া দিলে) তিনি খুশবু ফিরিয়ে দিতেন না এবং বলতেন, নবী ﷺ খুশবু প্রত্যাখ্যান করতেন না (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯২৯)। তবে কোনো নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না (তিরমিযী, হা/২৭৮৬)।

প্রশ্ন (২৯): কুরআন-হাদীছের আলোকে শরীরে ইনজেকশন ব্যবহারের বিধান কী? এসব কি কুরআন-হাদীছে আছে?

-মো. হাসান
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর: চিকিৎসার একটা ধরন হলো ইনজেকশন। হারাম উপাদানমুক্ত ইনজেকশন হলে চিকিৎসার প্রয়োজনে ইনজেকশন ব্যবহার করা জায়েয। আল্লাহ বলেন, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ‘তোমরা নিজেদের ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না’ (আল-বাকারা, ২/১৯৫)। কিছু বেদুঈন এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা কি চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করব? তিনি বলেন, ‘তোমরা চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করো, কেননা মহান আল্লাহ একমাত্র বার্ধক্য ছাড়া সকল রোগেরই ঔষধ সৃষ্টি করেছেন’ (সুনানে আবী দাঊদ, হা/৩৮৫৫)।

প্রশ্ন (৩০): মসজিদের ভেতরে স্কুল-কলেজের পাঠ্য বই প্রাইভেট বা কোচিং করানো বৈধ হবে কি?

-শাহিদুল ইসলাম
কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তর: মসজিদ আল্লাহর ঘর, যা ইবাদত ও আল্লাহর স্মরণের স্থান। তার সম্মান রক্ষা করে চলতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। কাজেই আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না’ (আল-জিন, ৭২/১৮)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘এটা হলো মসজিদ। এখানে প্রস্রাব করা কিংবা ময়লা-আবর্জনা ফেলা যায় না। বরং এটা হলো আল্লাহর যিকির করা, ছালাত আদায় করা এবং কুরআন পাঠ করার স্থান’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৫)। তাই মসজিদকে কোচিং সেন্টারের ন্যায় ব্যবহার করে কোচিং করানো বা সেখানে স্কুল-কলেজের বই প্রাইভেট পড়ানো বৈধ হবে না। কেননা মসজিদকে এ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়নি।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩১): বিবাহসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দফ বাজানো কি জায়েয? এর দলীল কী? এক হুজুর বলেছেন, বর্তমানে দফ বাজানো হারাম।

-শাফিউর রহমান শুয়াইব
পবা, রাজশাহী।

উত্তর: দফ হলো ছোট একমুখো ঢোল। বিবাহ, ঈদ বা কোনো সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর বৈধতা রয়েছে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার নিকট এলেন। এ সময় মিনার দিবসগুলোর এক দিবসে তার নিকট দুটি মেয়ে দফ বাজাচ্ছিল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাদর আবৃত অবস্থায় ছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৯৮৭)। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ অধ্যায় রচনা করেছেন, ‘বিয়ে ও ওয়ালিমায় দফ বাজানো’। রুবাই বিনতে মুআব্বিয ইবনু আফরা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বাসর রাতের পরের দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন এবং আমার বিছানার ওপর বসলেন, যেমন বর্তমানে তুমি আমার কাছে বসে আছ। সে সময় আমাদের ছোট মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিল এবং বদরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী আমার বাপ-চাচাদের শোকগাঁথা গাচ্ছিল (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৪৭)। বুরায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো এক যুদ্ধাভিযানে যান। তিনি ফিরে এলে এক কৃষ্ণবর্ণা মেয়ে এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি মানত করেছিলাম যে, আপনাকে আল্লাহ তাআলা সুস্থাবস্থায় ফিরিয়ে আনলে আপনার সম্মুখে আমি দফ বাজাব এবং গান করব। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, ‘তুমি সত্যিই যদি মানত করে থাক তবে দফ বাজাও, তা না হলে বাজাইও না’ (তিরমিযী, হা/৩৬৯০)। উল্লেখ্য যে, যেকোনো অনুষ্ঠানে ডুলি, ঢাক-ঢোল, তবলা ইত্যাদি বাজানো জায়েয নয়। বরং তা হারাম। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৯০)।

প্রশ্ন (৩২): আমার হোমমেড (বাড়িতে বানানো) কেকের ব্যবসা আছে দীর্ঘ ৪ বছর। হোমমেড কেকের ব্যবসা হালাল হবে কি? পাশাপাশি কেক তৈরিতে ব্যবহৃত সকল প্রোডাক্ট অর্থাৎ বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালস বিক্রয় করা কি হালাল হবে?

-মো. মেহেদী হাসান
নাটোর সদর।

উত্তর: কেক তৈরিতে ব্যবহৃত সমস্ত উপাদান যদি হালাল হয়, যেমন- ময়দা, চিনি, ডিম, বাটার ইত্যাদি; তবে কেকের ব্যবসা বৈধ এবং এগুলি বিক্রি করা হালাল হবে। আর কেক তৈরিতে যদি অ্যালকোহল বা কোনো হারাম বা ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা বৈধ হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন’ (আল-বাকারা, ২/২৭৫)। এছাড়া কোনো জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, গায়ে হলুদ বা কোনো দিবস উপলক্ষে কোনো অর্ডার নিয়ে সে অনুযায়ী শুভ জন্মদিন, হ্যাপি অ্যানিভার্সারি ইত্যাদি লিখে ব্যবসা করা যাবে না। কেননা এতে অন্যায় কাজে সাহায্য করা হবে। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৩৩): আমি একজন গার্মেন্টস স্টক লট ব্যবসায়ী। আমি ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন ব্র্যান্ড এর কাপড় গার্মেন্টস থেকে কিনি এবং বঙ্গবাজার বিক্রি করি। আমার কাছে মেয়েদের টি-শার্ট, মেয়েদের হাফ প্যান্ট, ট্রাউজার ইত্যাদি থাকে। এগুলো কি বিক্রি করা যাবে?

-মো. নূরে কাশেম খান
ঢাকা।

উত্তর: মেয়েদের পোশাক ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কয়েকটি শর্তে- ১. কোনো মানুষ বা প্রাণীর ছবিযুক্ত পোশাক হওয়া যাবে না (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৮১)। ২. দেহের অবয়ব দেখা যায়, এমন পাতলা বা আটোসাঁটো পোশাক হওয়া যাবে না (ছহীহ মুসলিম হা/২১২৮)। ৩. বিধর্মী ও বিজাতীয় পোশাক যাতে না হয়, যেমন- গেরুয়া রংয়ের হিন্দুদের ধর্মীয় পোশাক, নায়ক-নায়িকা ও গায়ক-গায়িকাদের পোশাক (আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)। ৪. অশ্লীলতা বা বেহায়াপনা প্রকাশ পায় এমন পোশাক। যেমন- টি-শার্ট, ট্রাউজার এগুলো পুরুষদের পোশাক আর পুরুষের পোশাক মহিলাদের পরা নিষিদ্ধ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৫)। এগুলো মহিলারা পরার মাধ্যমে সমাজে অশ্লীলতা প্রকাশ পায়। পশ্চিমাদের সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মেয়েরা হাফ প্যান্ট পরে বাহিরে বের হয়, যা তাদের লজ্জাহীনতার প্রমাণ বহন করে। তাই মেয়েদের এগুলো বিক্রি করা যাবে না, করলে এতে অন্যায় কাজে সাহায্য করা হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৩৪): আমি প্রিন্টিং প্রেস এর ব্যবসা করি। আমার ব্যবসায় কিছু কিছু কাজে অর্ধেকেরও বেশি লাভ করি, আবার কিছু কিছু কাজে সামান্য লাভ করি। আমার ব্যবসা কি হালাল হবে?

-বোরহান উদ্দীন
সাভার, ঢাকা।

উত্তর: চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে দাম নির্ধারিত হয়ে থাকে। অনেক সময় লাভ দ্বিগুণও হতে পারে। কেননা শরীআতে লাভ করার কোনো পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে (ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা বা বাতিল করা)। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়' (ছহীহ বুখারী, হা/২০৭৯)। একদা উরওয়া ইবনু আবিল জা'দ আল-বারেক্বী নামক জনৈক ছাহাবীকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি দীনার প্রদান করেন একটি ছাগল ক্রয়ের জন্য। ছাহাবী তা দিয়ে দুটি ছাগল ক্রয় করেন এবং একটি বিক্রয় করেন এক দীনারে। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে একটি ছাগল ও একটি দীনার ফেরত দেন। এতে খুশি হয়ে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার ব্যবসায়ে বরকতের দু'আ করেন। তাতে ফল হয়েছিল এই যে, ঐ ব্যক্তি মাটি কিনলেও তাতে লাভ হতো' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৪২; আবূ দাঊদ হা/৩৩৮৪)। ব্যবসা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সততা ও ন্যায্যতা রক্ষা করতে হবে। ক্রেতার সাথে প্রতারণা না করে বা তাকে না ঠকিয়ে লাভ করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৫): যে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে যে কোনো পণ্য ক্রয় করার সময় ১২/১৬ মাসের EMI মাধ্যমে ক্রয় করা কি ঠিক হবে? উল্লেখ্য, যে কোনো পণ্যের দাম ৫০ টাকা; কিন্তু EMI এর মাধ্যমে ১২/১৬ মাসে সেই টাকা পরিশোধ করলে সেখানে বাড়তি কিছু টাকা দিতে হয়।

-মো. ইবরাহিম
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর: ইএমআই (EMI) Equated Monthly Installment হলো একটি পদ্ধতি যেখানে মাসিক কিস্তিতে ক্রয়বিক্রয় করা হয়। বিনা সূদে কিস্তি বা ০% সূদে ইএমআই হলে তা বৈধ। যেমন- কোনো পণ্য নগদে ১২০ টাকা হলে ৩ মাসে ৪০ টাকা করে ১২০ টাকা। যেমনভাবে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বারীরাকে আজাদ করেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৬)। তবে বাড়তি মূল্য পরিশোধ করতে হলে তা বৈধ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একই বিক্রির মধ্যে দুই রকমের বিক্রি হতে নিষেধ করেছেন (মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/২৪৪৪; তিরমিযী, হা/১২৩১)। অতএব, এভাবে বাকিতে অতিরিক্ত মূল্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না।

প্রশ্ন (৩৬): আমাদের এলাকায় ব্যাপকভাবে তামাক চাষ করা হয়। তামাক চাষের ইসলামী বিধান কী? এটা দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখে। আমাদের অঞ্চলের বেশিরভাগ জমিতে তামাক চাষ হয়।

-হোসাইন
রংপুর।

উত্তর: তামাক নেশাদার দ্রব্য। আর কোনো নেশাদার বস্তু চাষাবাদ করা হারাম। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নেশা উদ্রেককারী প্রত্যেক জিনিস মদ আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসই হারাম' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৪৩)। এছাড়াও তামাক দিয়ে ধূমপানের মাধ্যম তৈরি করা হয়, যেমন- বিড়ি, সিগারেট বা পানের সাথে খাওয়া হয়। শুধু দেশের অর্থনীতিতে অবদান নয়, বরং একটি দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি যদি তামাক হয়; তবুও হারামকে হালাল বানানোর কোনো সুযোগ নেই। আর্থিকভাবে অবদান রাখলেও এগুলো خبائث এর অন্তর্ভুক্ত, যা অপবিত্র ও হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেন' (আল-আ'রাফ, ৭/১৫৭)। যেখানে তামাক উৎপাদন করা হয়, সেখানে হালাল পণ্য উৎপাদন হবে না মনে করা আল্লাহর নেয়ামতকে সংকীর্ণ মনে করা; যা বৈধ নয়। এছাড়া এটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং তামাকের চাষাবাদ, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-

বাণিজ্য করা হারাম। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করেছে অতঃপর তা থেকে তওবা করেনি, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/২০০৩)।

পারিবারিক জীবন

প্রশ্ন (৩৭): আমার স্ত্রীর তিনটি সিজার হয়েছে। তিন নম্বর সিজারের সময় ডাক্তার আমার কাছে আমার স্ত্রীর স্থায়ীভাবে গর্ভ বন্ধ করার অনুমতি চাইলে আমি অনুমতি দিয়ে দেই। কারণ আমার স্ত্রীর শারীরিক গঠন দুর্বল। এতে করে আমার স্ত্রীর স্থায়ীভাবে গর্ভ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় আমার কি গুনাহ হতে থাকবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: স্ত্রীর শারীরিক কোনো কারণে অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৩৮)। তবে স্থায়ী বাচ্চা নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হারাম ও কাবীরা গুনাহ। স্থায়ীভাবে স্ত্রীর গর্ভাশয় বন্ধ করা উচিত হয়নি; বরং তা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। এমতাবস্থায় স্থায়ীভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ; আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (আয-যুমার, ৩৯/৫৩)।

প্রশ্ন (৩৮): একজনের সামনে মজার ছলে আমার বউয়ের ব্যাপারে বলেছি যে, সে আমার আপন ছোট বোন। ইসলামে এর বিধান কী?

-মোখলেছুর রহমান
রংপুর।

উত্তর: যিহার শুধু মায়ের সাথে হয়ে থাকে। যিহার হলো কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলবে, তোমার পিঠ আমার মায়ের পিঠের মতো। তখন তার জন্য কাফফারা দেওয়া ছাড়া স্ত্রী মিলন বৈধ হবে না। উল্লেখ্য যে, যেকোনো মাহরাম মহিলার সাথে যিহার হয় বলে যে আলোচনা আছে তা প্রমাণিত নয়। অতএব, বোনের সাথে তুলনা করে থাকলে তা যিহার বলে গণ্য হবে না। তাকে কাফফারা দিতেও হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে (তারা জেনে রাখুক যে) তাদের স্ত্রীরা তাদের মাতা নয়; যারা তাদেরকে জন্মদান করে, শুধু তারাই তাদের মাতা, তারা তো অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে' (আল-মুজাদালা, ৫৮/২)। যালেম বাদশার হাত থেকে বাঁচার জন্য ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্ত্রী সারাকে বোন হিসেবে পরিচয় দেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৫৮)। স্ত্রীকে বোন বলা অপছন্দনীয় এবং নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে যে হাদীছটি এসেছে তা যঈফ বা দুর্বল। হাদীছটি হলো, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, হে আমার বোন! আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে কি তোমার বোন?' তিনি তার এ রকম সম্বোধনকে অপছন্দ করলেন এবং এ রকম সম্বোধন করতে নিষেধ করলেন (আবূ দাঊদ, হা/২২১০)।

প্রশ্ন (৩৯): আমি আমার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দেই। তারপর হুজুরকে জানালে বলে, তিন মাস পর হিল্লা দিয়ে তার তিন মাস পর বিয়ে করলে হালাল হবে। আমি তাই করি। আমার স্ত্রী PCOD (Polycystic Ovarian Disease) রোগী (মাসিক অনিয়মিত)। একসাথে তিন তালাক দেওয়ার পর থেকে হিল্লার তিন মাস পর আমাদের নতুন বিয়ের আগে পর্যন্ত তিনটা মাসিক হয়নি। (তবে হিল্লার আগে তিন মাস ও পরের তিন মাস আমাদের মাঝে সম্পর্ক ছিল। হুজুরকে জানালে বলে তওবা করে নিলে নতুন বিয়েতে সমস্যা হবে না। হুজুর বলে, অনিয়মিত মাসিক হলে তিন মাস ইদ্দত। হিল্লার তিন মাস পর মেয়ের বাবার উপস্থিতিতে নতুন করে বিয়ে করে আমরা সংসার করছি, আমাদের এখন সন্তান আছে। দয়া করে জানাবেন আমাদের সংসার এখন বৈধ আছে কি-না। আর অতীতের জন্য কি ক্ষমা আছে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: প্রথমত, একসাথে তিন তালাক দিলে তা এক তালাকই হয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর শাসন আমলের প্রথম দুই বছর পর্যন্ত এক বৈঠকে দেওয়া তিন তালাক এক তালাক বলেই গণ্য ছিল। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এবং আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতের প্রথম দুবছর পর্যন্ত তিন তালাক এক তালাক সাব্যস্ত হতো। পরে উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, লোকেরা একটি বিষয়ে অতি ব্যস্ততা দেখিয়েছে যাতে তাদের জন্য ধৈর্যের (ও সুযোগ গ্রহণের) অবকাশ ছিল। এখন যদি বিষয়টি তাদের জন্য কার্যকর সাব্যস্ত করে দেই... (তবে তা-ই কল্যাণকর হবে)। সুতরাং তিনি তা তাদের জন্য বাস্তবায়িত ও কার্যকর সাব্যস্ত করলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৫৬৫)। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, আবূ রুকানা নামে একজন লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীকে তার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, এটা এক তালাক হয়েছে (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৮৭; বায়হাক্বী, হা/১৪৭৬৪)। তাই কেউ যদি একসাথে তিন তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সেটা এক তালাক

বলে গণ্য হবে। আর উক্ত স্বামী তার স্ত্রীকে তিন মাসিকের মধ্যে নতুনভাবে বিবাহ পড়ানো ছাড়াই ফিরিয়ে নিতে পারবে। যেহেতু তিন মাসিক শেষ হওয়ার আগেই স্ত্রীর সাথে মেলামেশা হয়েছে, সুতরাং সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই আছে। এছাড়া ১. তিনমাস অপেক্ষা বা নতুন বিবাহ করা জায়েয হয়নি। ২. 'হিল্লা বিবাহ' শরীআতে সম্পূর্ণরূপে হারাম। যে হিল্লা বিবাহ দেওয়া হয়েছে তা যেনা হিসেবে বিবেচিত হবে। হিল্লা বিবাহের মাধ্যমে সন্তান হলে তা হবে যেনার সন্তান। উক্ববা ইবনু আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের ভাড়াটিয়া পাঁঠা সম্পর্কে বলব না? তারা বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি বললেন, 'সে হলো হিল্লাকারী আর হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কেই আল্লাহ লা'নত করেছেন' (ইবনু মাজাহ, হা/১৯৩৬; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, হা/১৪১৮৭)। ৩. এমতাবস্থায় তাদের আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

প্রশ্ন (৪০): স্ত্রীকে সতর্ক করার জন্য যদি বলা হয়, তুমি যদি আসলেই এতটা স্বামীর আয়ত্বের বাহিরে চলতে চাও, ইসলামী কথা না শুন, না মান; তাহলে তালাক দিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিব। কথাটি বললে তালাক পতিত হবে কি বা কোনো সমস্যা হবে কি?

-মুহাম্মদ সালমান রহমানী
ছোনটিয়া বাজার, জামালপুর।

উত্তর: এভাবে বলার দ্বারা তালাক পতিত হয়নি। কেননা এসব কথা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর সাথে সংসার করতে পারব না মনে করলে সামাজিকভাবে সমাধানে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর, তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও। যদি তারা মীমাংসা চায়, তাহলে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মিল করে দিবেন' (আন-নিসা, ৪/৩৫)। কিন্তু তালাক অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়, তাই এ জাতীয় শব্দ যেকোনোভাবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা আল্লাহর বিধানকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু করো না' (আল-বাক্বারা, ২/২৩১)।

প্রশ্ন (৪১): আমরা জানি মেয়ের অভিভাবক ছাড়া বিবাহ একদম বাতিল; কিন্তু আমরা এটাও জানি যে, ছালাত না পড়লে কেউ মুসলিম থাকে না। এখন মেয়ের অভিভাবক কেউ ছালাতের ধারেকাছেও নাই। এমতাবস্থায় মেয়ের বিবাহ কীভাবে হবে? কোর্টে বা কাজী অফিসে বিবাহ করা যাবে কি?

-আবূ সাইফ
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর: একজন মেয়ের পিতা ছালাত আদায় করে না বলে সে মেয়ের বিবাহ কোর্টে বা কাজী অফিসে দেওয়া জায়েয হবে না। যতক্ষণ না মেয়ের পিতার স্বীকৃতি পাওয়া যায় যে, তিনি ছালাত অস্বীকার করেন। আর ছালাত অস্বীকার করলেই একজন মানুষ অমুসলিম হতে পারে। মৌখিকভাবে এভাবে বলার দ্বারা পিতার অভিভাবকত্ব বাতিল করা যাবে না। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে নারী তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়াই নিজে নিজে বিবাহ করে; তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪৪১৭; আবূ দাঊদ, হা/২০৮৩; তিরমিযী, হা/১১০২)।

প্রশ্ন (৪২): নারীরা কি বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: দ্বীনদার ও সৎচরিত্রবান কাউকে পেলে উত্তম হলো, অলীর মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে করবে' (আন-নিসা, ৪/২৫)। তবে ফেতনামুক্ত পরিস্থিতি হলে কোনো মহিলা সৎ কোনো পুরুষকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারে। তবে বিবাহ অলীর মাধ্যমেই হতে হবে। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, একজন মহিলা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার কি আমার প্রয়োজন আছে? এ কথা শুনে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কন্যা বললেন, সেই মহিলা কতই না নির্লজ্জ! ছি লজ্জার কথা! আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সে মহিলা তোমার চেয়ে উত্তম, সে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য পেতে অনুরাগী হয়েছিল। এ কারণেই সে নিজেকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পেশ করেছে (ছহীহ বুখারী, হা/৫১২০)।

প্রশ্ন (৪৩): আমার বাবা প্রতিবার আমার থেকে তার এক সন্তানকে ঈদ খরচ বেশি দেয় এবং এতে আমি মনে মনে খুব কষ্ট পাই। এবার আমি অভিমান করায় তিনি এক প্রকারের বাধ্য হন আমাকে সমান টাকা দিতে। এখন এর জন্য কি আমি গুনাহগার হব?

-আজমীর রহমান রাফসান
বয়রা, খুলনা।

উত্তর: সন্তানদের কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতামাতার উচিত সব সন্তানকে সমানভাবে দেওয়া। কাউকে বেশি ভালোবেসে বেশি দেওয়া যাবে না। নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলেন এবং বললেন, আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম দান করেছি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সব পুত্রকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ?' তিনি বললেন, না। তিনি বললেন, 'তবে তুমি তা ফিরিয়ে নাও' (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৮৬)।

আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহকে ভয় করো এবং সন্তানদের মাঝে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করো' (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৮৭)। পিতামাতা এমন কিছু করলে তাদেরকে বুঝাতে হবে, তবুও তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'পিতামাতার অবাধ্য হবে না, যদিও তারা তোমাকে তোমার পরিবার ও সম্পদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়' (ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৫৭০)। তিনি আরো বলেন, 'পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি' (তিরমিযী, হা/১৮৯৯)।

প্রশ্ন (৪৪): আমরা ৪ ভাইবোন, আমি সবার ছোট। আমার জন্মের সময় মা মারা যাওয়ার কারণে আমার দাদি, নানি, আপন বড় বোন, ভাবি, মামি, খালা, চাচি, ফুফুদের প্রত্যেকেই কমবেশি সময় ধরে আমাকে বুকের দুধ পান করিয়েছেন ২ বছর বয়স পর্যন্ত। পাঁচ বারের অধিক পূর্ণ দুধপান করিয়েছেন সকলেই। তাই ইসলামী শরীআহ মোতাবেক তারা সকলেই আমার দুধমাতা। এখন আমার বাকি দুই আপন বড় ভাই এবং বড় বোন কি চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো সম্পর্কীয় অন্য ভাই কিংবা বোনের সাথে বিবাহ বৈধ হবে?

-অরণ্য
খুলনা।

উত্তর: এমন ক্ষেত্রে তাদের সাথে তার ভাইবোনের বিবাহ বৈধ। কেননা হুকুম তার উপর বর্তাবে, তার ভাইবোনের উপর নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে... তোমাদের সে সব মাতাকে যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোনদেরকে...' (আন-নিসা, ৪/২৩)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জন্মসূত্রে যারা হারাম, দুধ সম্পর্কের কারণেও তারা হারাম' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৪১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৪৫)।

আয়াত ও হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৫): 'ফরয ইবাদতের পর হালাল রিযিক অন্বেষণ করা আরেকটি ফরয' উক্ত হাদীছ কি ছহীহ?

-গোলাম রাব্বি
বরিশাল।

উত্তর: উক্ত বক্তব্য সঠিক, তবে উক্ত হাদীছটি যঈফ। আব্বাদ বিন কাছীর বিন কায়েস আর-রমালী উক্ত হাদীছকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি যঈফ রাবী (সুনান কুবরা, বায়হাক্বী, হা/১১৬৯৫; শুআবুল ঈমান, হা/৮৩৬৭)। ইমাম নাসাঈ রাহিমাহুল্লাহ তার ব্যাপারে বলেছেন, তিনি শক্তিশালী রাবী নয়। ইমাম আবূ যুরআ ও আবূ হাতেম রাহিমাহুমাল্লাহ বলেছেন, তিনি দুর্বল। ইমাম হাকেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি সুফিয়ান ছাওরী থেকে কিছু জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১০/৪২২ টিকা দ্রষ্টব্য)। আর হালাল রূযী উপার্জন করা আল্লাহর আদেশ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মানব জাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করো' (আল-বাকারা, ২/১৬৮)। তিনি রাসূলদের বলেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা হালাল পবিত্র উত্তম রিযিক খাও আর সৎকর্ম করো' (আল-মুমিনূন, ২৩/৫১)। অন্য জায়গায় মুমিনদের উদ্দেশ্যে করে বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা হালাল উত্তম রিযিক আহার করো, যা আমি তোমাদের দিয়েছি' (আল-বাকারা, ২/১৭২)।

প্রশ্ন (৪৬): পাওনা টাকা আদায়ের জন্য কোনো দু'আ বা আমল আছে কি?

-ফাতেমা
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: পাওনা টাকার যে নির্ধারিত সময় রয়েছে সে সময়ে আদায় করার চেষ্টা করবে। স্বাভাবিকভাবে না দিলে যেকোনো শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক লোক (ঋণ পরিশোধের) তাগাদা দিতে আসল এবং কড়া কথা বলল। ছাহাবীগণ তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলে নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও। হক্বদারের (কড়া) কথা বলার অধিকার আছে' (ছহীহ বুখারী, হা/২৪০১)। এরপরও যদি না হয়, তাহলে আইনের আশ্রয় নিবে এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ 'তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও' (আল-বাকারা, ২/৪৫)।

প্রশ্ন (৪৭): اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي شَكُورًا وَاجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا দু'আটা কি ছহীহ?

-আইয়ুব বিন আব্দুল্লাহ
ঢাকা।

উত্তর: উক্ত হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছে উকবা বিন আব্দুল্লাহ আল-আছম নামক একজন দুর্বল রাবী থাকায় উক্ত হাদীছটি যঈফ (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০/১৮১)। হাদীছটি হলো, বুরায়দা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নিশ্চয় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي شَكُورًا وَاجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا (আল-জামিউছ ছগীর, হা/৩০৯২; মুসনাদে বাযযার, হা/৪৪৩৯; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হা/১৭৪১২)।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৮): রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি কখনো কারাগারে ছিলেন?

-রবিউল ইসলাম
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর: না, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনো কারাগারে ছিলেন না। তবে কারাগারের কথাটি আল্লাহ ও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তিনি সামাজিকভাবে বয়কট অবস্থায় ছিলেন। কুরাইশরা তাকে

বয়কট করে বনু হাশেমের সাথে শিয়াবে আবী তালিবে ৩ বছর অবরুদ্ধ রেখেছিল। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সাধারণত অপরাধী ও যুদ্ধবন্দিদের মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হতো। যেমন- সুমামা বিন উসাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তিন দিন মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় (ছহীহ বুখারী, হা/৪৬২)।

প্রশ্ন (৪৯): কোনো ব্যক্তির নামে আমি গীবত করেছি। তার কাছে মাফ চাইব, কিন্তু সেই ব্যক্তিকে খুঁজে পাচ্ছি না অথবা সেই ব্যক্তি মারা গেছে, এখন করণীয় কী?

-মাসুদ আলম
ঢাকা।

উত্তর: গীবত করা অনেক বড় পাপ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন একে অপরের গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি স্বীয় মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে পছন্দ করে? অনন্তর তোমরা তা অপছন্দ কর' (আল-হুজুরাত, ৪৯/১২)। যদি কেউ এমন হয়ে থাকে, তাহলে তাকে ঐ ব্যক্তির থেকে মাফ নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোনো বিষয়ে যুলমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ হতে মাফ করিয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোনো দীনার বা দিরহাম থাকবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯)। এছাড়াও তার উচিত হলো- ১. আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার সাথে সাথে অনুতপ্ত হওয়া, ২. যাদের গীবত করা হয়েছে তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন মজলিসে সুনাম বর্ণনা করা এবং তাদের ভালো গুণাবলির কথা উল্লেখ করা, ৩. তাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলা এবং কেউ তাদের প্রতি কটাক্ষ করলে বা বদনাম করলে তা প্রতিহত করা, ৪. এছাড়া তাদের জন্য গোপনে ক্ষমা প্রার্থনা করা (মাদারিজুস সালেকীন, ১/২৯১)।

প্রশ্ন (৫০): কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত মোবাইল দিয়ে শুনলে কোনো নেকী হবে কি?

-মো. জহির
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

উত্তর: মুখে হোক বা যন্ত্রের মাধ্যমে হোক নেকীর আশায় মনোযোগ সহকারে কুরআন শুনলে নেকী পাবে। আল্লাহ তাআলা কুরআন শ্রবণ করার আদেশ করেছেন। তিনি বলেন, 'যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়' (আল-আ'রাফ, ৭/২০৪)। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলাম। তিনি বললেন, 'আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও'। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার উপর কি কুরআন নাযিল হয়নি এবং আপনার থেকেই কি আমরা তা শিখিনি? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমি অন্যের কাছ থেকে শুনতে পছন্দ করি' (মুসনাদে আহমাদ, হা/৩৫৫০)।

সম্পাদকীয় এর বাকী অংশ

একদিকে যেখানে ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘুদের এই করুণ অবস্থা সেখানে আমেরিকার গোয়েন্দা প্রধান তুলসী গ্যাবার্ড ভারতে বসে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে তার আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেন। যা অত্যন্ত আশ্চর্য হলেও চরম দ্বিচারিতা। আমরা এহেন বৈষম্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। আমাদের জন্য সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, ইসরাঈল যেভাবে গাযা তৈরি করেছে ভারতও চায় বাংলাদেশকে দ্বিতীয় গাযা বানাতে। ইসরাঈলের জায়নিস্টরা যেমন সুপারিওরিটি থিউরিতে বিশ্বাস করে ঠিক তেমনি ব্রাহ্মণরাও সুপারিওরিটি থিউরিতে বিশ্বাস করে। তথা তারাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক বাছাইকৃত। আর বাকীরা সবাই বংশগতভাবে তাদের চেয়ে নিম্ন স্তরের। মহান আল্লাহর ভাষ্য অনুযায়ী ইয়াহূদীরা ও মুশরিক হিন্দুরা সবচেয়ে বেশি মুসলিমবিদ্বেষী হবে *(আল-মায়েদা, ৫/৮২)*।

ফিলিস্তীন ভেঙে ইসরাঈলের তৈরি হওয়া আর মুসলিমদের অখণ্ড ভারত ভেঙে হিন্দুদের ভারত তৈরি হওয়ার সময়ও অনেকটা সমসাময়িক। একটা ১৯৪৭ আরেকটা ১৯৪৮। ভৌগোলিকভাবে গাযার মানুষের যেমন এক দিকে সমুদ্র বাকী সকল দিকে ইসরাঈল। ঠিক তেমনি আমাদেরও এক দিকে সমুদ্র আর বাকি সকল দিকে ভারত। সুতরাং বাংলাদেশের দ্বিতীয় গাযা হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এই আশঙ্কাকে সামনে রেখেই গত ১২ এপ্রিল, রোজ শনিবার, বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ 'মার্চ ফর গাযা' অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ফিলিস্তীনে ইসরাঈলের হামলা দ্রুত বন্ধের পাশাপাশি, ভারতের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি উত্থাপন করা হয়। পাশাপাশি, সকল মুসলিম দেশকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জায়নবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। মহান আল্লাহ ফিলিস্তীন ও ভারতে বসবাসরত মুসলিমদেরকে রক্ষা করুন! বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যাবতীয় ষড়যন্ত্র থেকে অক্ষুণ্ন রাখুন- আমীন! *(প্র. স.)*

মাসিক আল-ইতিছাম-এর বর্ষভিত্তিক বোর্ড বাইন্ডিং সংগ্রহ করুন

প্রতি বর্ষ বোর্ড বাইন্ডিং-এর মূল্য **৪৬০ টাকা**

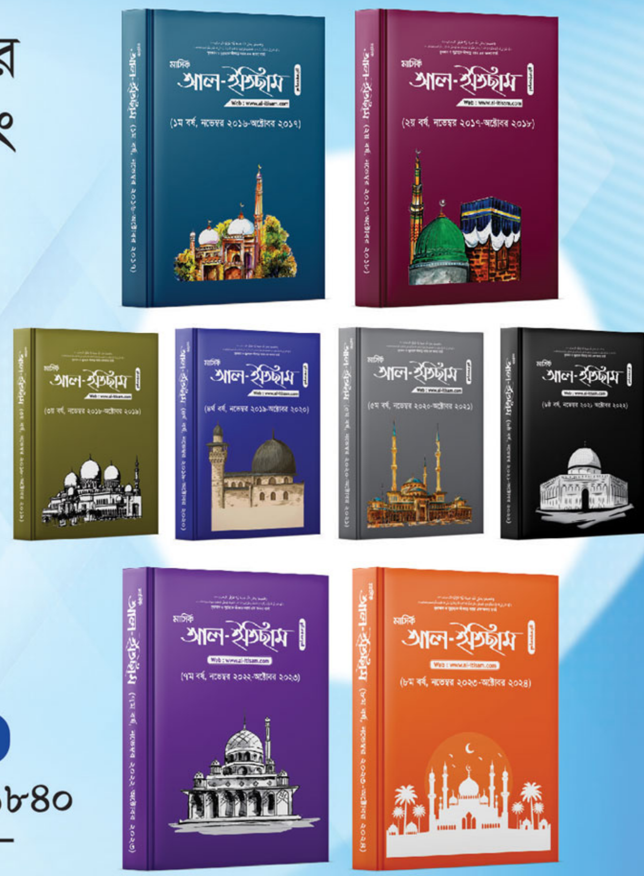

বোর্ড বাইন্ডিং পেতে যোগাযোগ করুন

০১৭৫০-১২৪৪৯০ ০১৪০৭-০২১৮৪০

alitisam2016 al-itisam.com

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য

মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

Monthly Al-Itisam الاعتصام 9th Year, 7th Part, May 2025, Price : 30.00